POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতে এবং তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পথসমূহ দেখাইয়া দিতে এবং তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

(সূরা নিসা, আয়াত: ২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 30

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার, 23শে জুলাই, 2020 ● 1 যুল হাজ্জা 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায় ঐশী শাস্তির ভয়ের পরিণামে। কিন্তু পাপের কারণে ধৃত হওয়ার সেই ভয় কেনই বা তৈরী হবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে আমাদের যাবতীয় পাপ যীশু কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বস্তুত এই ধরণের অবধারণার বিরাট মন্দ প্রভাব রয়েছে। এই মতবাদ না থাকলে ইউরোপের দেশগুলিতে এমন অবাধ পাপাচার ও অধার্মিকতার প্রসার ঘটত না এবং বর্তমানের ন্যায় ব্যাভিচারের প্লাবন দেখা দিত না।

আমাদের মতবাদ হল- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের মতবাদ মানুষকে পাপের বিষয়ে ধৃষ্ট করে তোলে

কেউ যদি বলে যে প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের উপর ঈমান আনলে মানুষ পাপের জীবন থেকে মুক্তি পেতে পারে আর তার মধ্যে পাপ করার শক্তি অবশিষ্ট থাকে না, তবে এমন দাবির কোন প্রমাণ নেই। কেননা এমন নীতির গোড়াতেই পাপ রয়েছে। পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায় ঐশী শাস্তির ভয়ের পরিণামে। কিন্তু পাপের কারণে ধৃত হওয়ার সেই ভয় কেনই বা তৈরী হবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে আমাদের যাবতীয় পাপ যীশু কাঁধে তুলে নিয়েছেন। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে এমন নীতিতে বিশ্বাসী মানুষ কখনও মুত্তাকী বা খোদাভীরু হতে পারে না। কেননা সে প্রতিটি কাজকে তাকওয়ার নীতির ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক বলে মনে করবে না। একথা ভালভাবে স্মরণ রেখো যে, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা সব সময় নীতি দ্বারাই সূচিত হয়।

অতঃপর আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের মতবাদে বিশ্বাসীরা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার কোন্ বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছে? ইউরোপবাসীর পাপাচার সর্বজনবিদিত। সকল অপরাধ ও দুষ্কর্মের জননী মদের এমন বহুল প্রচলন সেখানে রয়েছে যার তুলনা অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। আমি কোন এক সংবাদ-পত্রিকায় পড়েছিলাম যে লন্ডনের মদের দোকানগুলিকে সারিবদ্ধ করলে সেগুলির দৈর্ঘ হবে ৭৫ মাইল। যেভাবে তাদের প্রত্যেককে পাপের ক্ষমার প্রমাণপত্র দেওয়া হয়েছে আর তারা যে সমস্ত পাপ করবে সেগুলি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, খ্রীষ্টানরা চিন্তা করে বলুক, এমন অবধারণা কি পরিণাম ডেকে আনবে?

(নাউযুবিল্লাহ্) যদি আমরা এই নীতিতে বিশ্বাসী হতাম, তবে আমাদের উপর এর কি দুষ্প্রভাবই না পড়ত! মানুষের অবাধ্য প্রবৃত্তি যা তাকে পাপে প্ররোচিত করে, সব সময় এমন কিছুর সন্ধানেই থাকে যাকে অবলম্বন করে সে দাঁড়াতে পারে। যেমনটি শিয়ারা ইমাম হোসেন (রা.)কে অবলম্বন করেছে। আর তারা 'তাকিয়া' মতবাদের আড়ে যা খুশি বলে চলেছে। 'তাকিয়া' এবং ইমাম হোসেনের আত্মত্যাগ সর্বস্ব মতবাদের ভিত্তিতে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, শিয়াদের মধ্যে মত্তাকি কম পাওয়া যাবে। খলীফা মহম্মদ হাসান সাহেব লেখেন, فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত: ১০৮) কুরআন করীমের এই আয়াত ইমাম হোসেনের শহীদ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করছে। তিনি এই যুক্তি খাড়া করে বেশ আপ্লুত, যেন কুরআনের মর্মার্থই উদ্ধার করে ফেলেছেন।

তাঁর এই উদ্ভাবনী দক্ষতা দেখে এক অর্বাচীনের গল্প আমার মনে পড়ে যায়। গল্পটি এইরূপ- এক নির্বোধ ব্যক্তির কাছে একটি জলের পাত্র ছিল, যেটিতে একটি ছিদ্র ছিল। যখনই সে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেত, কাজটি সেরে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার উপক্রম করতেই পুরো পানি পাত্র থেকে বেরিয়ে যেত। অবশেষে বেশ কয়েকদিন চিন্তাভাবনার পর সে এই উপায় বের করল যে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার আগেই ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিতে হবে। সে নিজের এই সমাধান সূত্র পেয়ে বের করে বেশ আনন্দিত ছিল। এমন যুক্তি ও উপায় খলীফা মহম্মদ হাসানকে সেই নির্বোধ ব্যক্তির মতই বিচক্ষণ বানায়, যখন তিনি فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (সূরা সাফ্‌ফাত, আয়াত: ১০৮) আয়াত থেকে ইমাম হোসেনের শাহাদত সাব্যস্ত করেন। শিয়াদের মসজিদ পর্যন্ত পরিস্কার থাকতে পারে না। আমি এক শিয়া উস্তাদের কাছে পড়তাম, সেখানে কুকুর এসে প্রসাব ও পায়খানা করে যেত। সেখানে কেউ কখনও নামায পড়েছে বলে আমার স্মরণে নেই। শিয়ারা একথাই বলে যে তাদের জন্য ইমাম হোসেন (রা.) এবং আহলে বায়েত [রসূল করীম (সা.) এর পরিবার] শহীদ হয়েছেন। তাঁদের দুঃখে বিলাপ করা এবং শোক প্রকাশ করাই যথেষ্ট। জান্নাতের জন্য এটি ছাড়া অন্য কোনও কর্মের প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে খ্রীষ্টানরা বলে, মসীহ্‌র রক্ত তাদের মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। এখন আমার প্রশ্ন হল, এদেরকেও যদি পাপের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং পাপের শাস্তিভোগও করতে হয়, তবে তাদেরকে কি ধরণের মুক্তির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে?

বস্তুত এই ধরণের অবধারণার বিরাট মন্দ প্রভাব রয়েছে। এই মতবাদ না থাকলে ইউরোপের দেশগুলিতে এমন অবাধ পাপাচার ও অধার্মিকতার প্রসার ঘটত না এবং বর্তমানের ন্যায় ব্যাভিচারের প্লাবন দেখা দিত না। লন্ডন ও প্যারিসের হোটেল এবং পার্কগুলিতে গিয়ে দেখ ও সেখান থেকে ফেরত আসা মানুষদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, সেখানে কি হচ্ছে। প্রায় সংবাদ পত্রিকায় ঐ সমস্ত শিশুর তালিকা প্রকাশিত হয়, যারা অবৈধভাবে জন্মগ্রহণ করে।

প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের মতবাদ প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী।

মতবাদই আমার লক্ষ্য। আমাদের মতবাদ হল- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ (সূরা যিলযাল, আয়াত: ৮) এমন মতবাদের প্রভাব কিরূপ হবে তা তোমরা নিজেরাই কল্পনা করতে পার। এরফলে মানুষ কর্মের প্রয়োজন অনুভব করবে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করবে। কিন্তু এর বিপরীতে যখন ধরে নেওয়া হয় যে মানুষ কর্ম দ্বারা নাজাত বা মুক্তি লাভ করতে পারবে না, তখন এমন মতবাদ মানুষের সংকল্প এবং প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দিবে, তাকে সম্পূর্ণরূপে হতোদ্যম করে তুলে অসহায় বানিয়ে দিবে। এর থেকে জানা যায় যে কাফ্‌ফারার মতবাদ মানবীয় শক্তিবৃত্তিরও অসম্মান করে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানবীয় শক্তিসমূহের মধ্যে ক্রমোন্নতির উপাদান নিহিত রেখেছেন। কিন্তু কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত-বিধান এর উন্নতিতে বাধা দেয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬০-১৬২)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রসুল্লাহ (সাঃ) এর উত্তম আদর্শ এবং ব্যঙ্গ চিত্রের বাস্তবিকতা

(চতুর্থ খুতবা)

সারাংশ: খুতবা জুমা , ১০ই মার্চ ২০০৬ স্থান-বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন

মুসলমানদের মুষ্টিমেয় দলের ইসলামের বিপরীত কর্মধারা অমুসলিমদেরকে ইসলামের উপর আক্রমণ হানার সুযোগ এনে দেয়। আঁ হযরত (সাঃ) এর উপর অমুসলিমদের পক্ষ থেকে এই যে আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে , তিনি (সাঃ) নাউজুবিল্লাহ এমন ধর্ম নিয়ে এসেছেন যার মধ্যে কঠোরতা, হত্যা ও লুটপাঠ ছাড়া কিছুই নেই, যেখানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা , ধৈর্য্য এবং স্বাধীনতার ধারণাই নেই। এবং এই শিক্ষার প্রভাবই আজ মুসলমানদের স্বভাবের রূপ নিয়েছে। এই সম্পর্কে আমি পূর্বেও কয়েকবার বলেছি যে দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানদের মধ্যে থেকেই কিছু বর্গ ও শ্রেণী এই অবধারণা তৈরীর ব্যপারে সহায়ক হয়েছে । এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মধারাই অমুসলিম বিশ্বে এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্যে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ(সাঃ) সম্পর্কে অশ্লীল, কুরুচিকর, অত্যন্ত অশোভনীয় এবং কদর্য চিন্তাধারা প্রকাশ করার সুযোগ তৈরী করেছে। যেহেতু আমরা জানি, কিছু শ্রেণী ও বর্গের কর্মধারা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিকতার পরিপন্থী। ইসলামের শিক্ষা তো এমনই এক সুন্দর শিক্ষা যার সৌন্দর্য ও রূপ প্রত্যেক নিরপেক্ষ চিন্তাধারা সম্পন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রভাবিত করে।

অমুসলিমদের প্রতি সদয় আচরণ সম্পর্কে ইসলামের অনুপম সুন্দর শিক্ষা

কুরান করীমের মধ্যে একাধিক স্থানে ইসলামের এই সুন্দর শিক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে অমুসলিমদের প্রতি ভাল ব্যবহার , তাদের অধিকারসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়া , তাদের প্রতি ন্যায় ও সুবিচার করা, তাদের উপর ধর্মের বিষয়ে কোনো ধরণের বলপ্রয়োগ না করা, ধর্মের বিষয়ে কোনো কঠোরতা না করা ইত্যাদি বহু আদেশাবলী আমাদের ছাড়া অমুসলিমদের বিষয়েও রয়েছে। তবে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অনুমতিও রয়েছে , কিন্তু সেটা এই পরিস্থিতিতে যখন শত্রুরা আগাম পদক্ষেপ নেয়, চুক্তি ভঙ্গ করে , ন্যায়কে হত্যা করে , অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করে বা উৎপীড়ন করে , কিন্তু এক্ষেত্রে ও কোনো দেশের কোনো দল বা সংগঠনের অধিকার নেই বরং এটা সরকারের কাজ। সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে কি করা উচিৎ আর কিভাবে এই অত্যাচারকে বন্ধ করা যায়। যে কোনো জেহাদী সংগঠন এসে এই কাজ করতে শুরু করে দিবে এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

মক্কার কাফের ও ইসলামের শত্রুদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের জবাবে আঁ হযরত(সাঃ) এর মহান আদর্শ।

আঁ হযরত (সাঃ) এর যুগেও যুদ্ধের বিশেষ পরিস্থিতি তৈরী করা হয়েছিল। যার ফলে মুসলমানদেরকে বাধ্য হয়ে প্রতিরক্ষা স্বরূপ যুদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু যেরূপ আমি বললাম যে বর্তমানের জেহাদি সংগঠনগুলি কোনো বৈধ কারণ ও বৈধ অধিকার ছাড়াই নিজেদের যুদ্ধংদেহি স্লোগান ও কর্মধারা দ্বারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরকে এই সুযোগ করে দিয়েছে এবং এদের মধ্যে এমন দুঃসাহস তৈরী হয়ে গেছে যে তারা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও হঠধর্মীতার সঙ্গে আঁ হযরত(সাঃ) এর পবিত্র সত্তার উপর কদর্য আক্রমণ করেছে এবং করে চলেছে। অথচ মূর্তমান করুণা, মানবতার পরম হিতৈষী ও মানবাধিকারের মহান পরিত্রাতা এই সত্তা এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে যুদ্ধ চলাকালীন তিনি শত্রুদের জন্য সহজসাধ্যতা তৈরী করার কোনও সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না। তাঁর (সাঃ) জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম, প্রত্যেকটি ক্ষণ একথার সাক্ষী যে তিনি মুর্তিমান করুণা ছিলেন। এবং তাঁর বুকের মধ্যে এমন হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছিল যার থেকে বেশি দয়ালু আর কোনো হৃদয় করুণার সেই মানদন্ড ও দাবী পূর্ণ করতে সক্ষম নয় যা তিনি (সাঃ), শান্তি হোক বা যুদ্ধ পরিস্থিতি, ঘরে হোক বা বাইরে, প্রাত্যহিক দিনচর্চা ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কৃত চুক্তি- অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে করুণার সেই মান পূর্ণ করেছেন। তিনি (সাঃ) অভিব্যক্তির স্বাধীনতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও উদারতার মানদন্ড প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর তিনি (সাঃ) যখন মহান বিজয়ী রূপে মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন একদিকে যেমন বিজীত জাতির সঙ্গে ক্ষমা ও করুণার আচরণ করলেন অপরদিকে তাদেরকে ধর্মের স্বাধীনতারও পূর্ণ অধিকার দান করলেন। এবং কুরান করীমের এই আদেশের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। অর্থাৎ ধর্ম তোমাদের অন্তরের বিষয় , আমার তো এই আকাঙ্খা যে তোমরা সঠিক ধর্মকে স্বীকার করে নাও এবং নিজেদের পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনকে সুন্দর করে তোলো, নিজেদের ক্ষমালাভের উপকরণ তৈরী কর, কিন্তু কোনও বলপ্রয়োগ নয়। তাঁর (সাঃ) জীবন উদারতা এবং ধর্মীয় ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার এমন অগণিত উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ রয়েছে। আমি তার মধ্য থেকে গুটি কয়েকের উল্লেখ করব।

একথা কারো নিকট অবিদিত নয় যে মক্কায় তাঁর নবুয়তের দাবীর পর ১৩ বছরের জীবন কত কষ্টকর ও দূর্বিষহ ছিল, এবং তিনি (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবা (রাঃ) গণ কত দুঃখ ও বিপদাবলী সহ্য করেছেন। গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরে তপ্ত বালুকার উপর তাদেরকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। উত্তপ্ত পাথর তাঁদের বুকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাবুকাঘাত করা হয়েছে। মহিলাদের দুই পা চিরে হত্যা করা হয়েছে, শহীদ করা হয়েছে। তাঁর উপর বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার করা হয়েছে। সিজদারত অবস্থায় অনেক সময় উঁটের দেহের পরিত্যক্ত নাড়ি ভুড়ি এনে তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ভারে তিনি (সাঃ) উঠতে পারতেন না। তায়েফের সফরের সময় ভবঘুরে ছেলেদের দল তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে আঘাত করছিল। তারা তাঁর উদ্দেশ্যে অশালীন ও নোংরাভাষা প্রয়োগ করতে থাকে , আর তাদের সর্দার তাদেরকে উকসানি ও কুমন্ত্রণা দিয়ে উত্তেজিত করতে থাকে। তিনি এত ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন যে আপাদ মস্তক রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিলেন, উপর থেকে রক্ত বেয়ে জুতো পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

আবি তালিব উপত্যকার এর ঘটনা।

তিনি (সাঃ) এবং তাঁর পরিবার ও মান্যকারীদেরকে কয়েক বছর যাবত অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়। কোনো খাদ্য ও পানীয় ছিলনা। শিশুরা পর্যন্ত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিল। এইরূপ অবস্থায় অন্ধকারে মাটিতে পড়ে থাকা কোনও নরম বস্তু এক সাহাবীর পায়ে ঠেকে, তিনি সেটাকেই কোন খাবার জিনিস ভেবে মুখে পুরেছেন। ক্ষুধায় ব্যকুলতার এমন অবস্থা ছিল। অবশেষে এই অবস্থা থেকে নিরুপায় হয়ে হিজরত করতে হয় এবং হিজরত করে মদিনায় আসার পর সেখানেও শত্রুরা পিছু ছাড়েনি , তারা আক্রমণ করেছে। তারা মদিনায় বসবাসরত ইহুদিদেরকে আঁ হযরত(সাঃ) এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। এই সকল পরিস্থিতিতে , যেরূপ আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি, যদি যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং নির্যাতিতরাও জবাব দেওয়ার সুযোগ পায় , প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পায় তবে এই চেষ্টাই করবে যে সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ যেন অত্যাচারের দ্বারা নেওয়া হয়। বলা হয় যে যুদ্ধে সব কিছু বৈধ। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ) এমন পরিস্থিতিতেও ক্ষমা ও করুণার শ্রেষ্ঠতম মানদন্ড স্থাপন করেছেন। মক্কা থেকে আসার পর কিছু কালই অতিবাহিত হয়েছিল, তখনও সমস্ত কষ্টের ক্ষত টাটকা করছিল । তিনি (সাঃ) নিজের কষ্টের চাইতে তাঁর মান্যকারীদের কষ্ট বেশি অনুভব করতেন। কিন্তু তথাপি তিনি (সাঃ) ইসলামী শিক্ষা এবং নীতিমালা বিসর্জন দেন নি। যে নৈতিক মানদন্ড তাঁর স্বভাব ও শিক্ষার অঙ্গ ছিল তা কখনও ভঙ্গ করেননি। আজকে দেখুন , কিছু পশ্চিমা দেশ যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণই না করছে। কিন্তু তার তুলনায় আঁ হযরত (সাঃ) এর আদর্শ দেখুন যা সম্পর্কে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

বদরের যুদ্ধের সময় যে স্থানে ইসলামী সৈন্য বাহিনী শিবির স্থাপন করেছিল সেটা এমন কোনো উপযুক্ত স্থান ছিলনা। এই কারণে হুবাব বিন মানজর (রাঃ) আঁ হযরত (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ যে স্থানটিকে আপনি শিবির স্থাপন করার জন্য নির্বাচন করেছেন সেটা কি খোদা তায়ালার কোনও ইলহামের অন্তর্গত? আপনাকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন না কি আপনি নিজে পছন্দ করেছেন? আপনার ধারণা, হয়তো এই স্থানটি লড়াইয়ের রণকৌশলের দিক থেকে উত্তম।” প্রত্যুত্তরে আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, “স্থানটি যেহেতু উঁচু, তাই রণকৌশলগত কারণেই আমার ধারণা ছিল যে এটি উত্তম স্থান।” তখন সেই সাহাবী বললেন, “এটা উপযুক্ত স্থান নয়। আপনি সৈন্যদের নিয়ে গিয়ে পানির প্রস্রবনের দখল নিন। আমরা সেখানে একটি জলাধার তৈরী করে নিব এবং তারপর যুদ্ধ করব। এই ভাবে আমরা পানি পাব কিন্তু শত্রুরা খাওয়ার জন্য পানি পাবেনা। ”তখন আঁ হযরত(সাঃ) বললেন, “তবে তাই হোক তোমার পরমর্শ মেনে নিচ্ছি।” সুতরাং সাহাবাগণ সেখানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। কিছু ক্ষণ পরে কুরায়েশদের কয়েকজন লোক পানি নেওয়ার জন্য জলাধারের কাছে আসলে সাহাবাগণ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন , কিন্তু আঁ হযরত(সাঃ) বললেন, “বাধা দিওনা, তাদেরকে পানি নিয়ে নিতে দাও। (আস সীরাতুন্নববীয়া লি ইবনে , হিশাম)

ইসলাম তরবারির শক্তিতে নয় বরং সদাচার ও ইসলামে অভিব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার শিক্ষার মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে।

অতএব এই হল আঁ হযরত (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠতম নৈতিক মানদন্ড । শত্রুরা

(শেষাংশ ১০ পাতায়...)

জুমআর খুতবা

প্রারম্ভিক যুগের সাহাবাদের আত্মত্যাগ এত বেশি ছিল যার তুলনা হওয়া সম্ভব নয়।

আঁ হযরত (সা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ সম্পর্কে বলেন, " সে মুসলনমাদের নেতাদের নেতা"। তিনি আরও বলেন, "আব্দুর রহমান উর্দ্ধলোকেও বিশ্বস্ত, ইহলোকেও বিশ্বস্ত।"

ওহদের যুদ্ধের দিন যখন অন্যেরা পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছিলেন,তখনও আব্দুর রহমান বিন অউফ রসুল করীম (সা.)-এর সঙ্গে অবিচল ছিলেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) এর একটি সৌভাগ্য হলো, মহানবী (সা.) তাঁর ইমামতিতে নামায পড়েছেন।। তিনি বলেন, " তোমার পিছনে একজন নবীর নামায পড়া এবিষয়ের সত্যায়ন করে যে তুমি একজন পুণ্যবান মানুষ।"

আশারায়ে মুবাশ্বেরা বা দশজন সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত আঁ হযরত (সা.) মর্যাদাবান বদরী সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা

যে সমস্ত সাহাবা আশারায়ে মুবাশ্বেরার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে আঁ হযরত (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে পরম খোদাভীতি ছিল, এতটাই যে সর্বক্ষণ তাঁরা বিচলিত থাকতেন।

আমি রসুলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি, "তোমরা যদি কোন স্থানে মহামারির প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাও; তাহলে সেখানে যেও না। আর মহামারী যদি তোমাদের নিজেদের লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে বাইরে বের হবে না। "

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১৯ই জুন , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (১৯ এহসান, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায় হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। এর কিছু অংশ বাকি রয়ে গিয়েছিল, যা আজ আমি বর্ণনা করব। উমাইয়্যা বিন খালফ এর সাথে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর পুরোনো বন্ধুত্ব ছিল। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত একটি ঘটনা সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি উমাইয়া বিন খালফকে এই মর্মে একটি পত্র লিখি যে, সে যদি মক্কায় আমার ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তাহলে আমি মদিনায় তার ধনসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করব। আমি আমার নাম আব্দুর রহমান লিখলে উমাইয়া বলে, আমি আব্দুর রহমানকে চিনি না। তুমি আমাকে নিজের অজ্ঞতার যুগের নাম বল। তিনি বলেন, তখন আমি আমার নাম আবদে আমর লিখি। সে বদরের যুদ্ধে যোগদান করে। লোকজন ঘুমিয়ে পড়লে আমি তার নিরাপত্তার জন্য একটি পাহাড়ের দিকে চলে যাই। তখন বেলাল কোনভাবে তাকে দেখে ফেলেন। তখন তিনি অর্থাৎ হযরত বেলাল সেখানে যান এবং আনসারদের একটি মজলিসে দাঁড়িয়ে বলেন, এ হলো উমাইয়া বিন খালফ, যদি আজ সে বেঁচে যায় তাহলে আমার রক্ষা নেই। এতে হযরত বেলাল-এর কিছু লোক আমাদের (অর্থাৎ হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ এবং উমাইয়্যা বিন খালাফ-এর) পশ্চাদ্ধাবন করে, কেননা তিনি তাকে রক্ষা করতে ও আশ্রয় দানের জন্য যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এরা আমাদেরকে ধরে ফেলবে বলে আমার আশঙ্কা হল। তাই আমি তাকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তার পুত্রকে পিছনে রেখে যাই যেন তারা তার সাথে অর্থাৎ পুত্রের সাথে লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যে মুসলমানরা পিছু ধাওয়া করছিল, তারা লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আমরা কিছুটা সামনে এগিয়ে যেতে পারব এবং আমি তাকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু তারা অর্থাৎ মুসলমানরা তাকে অর্থাৎ তার পুত্রকে হত্যা করে। তিনি আরো বলেন, তারা আমার কৌশল সফল হতে দেয় নি এবং আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। উমাইয়্যা যেহেতু স্থূলকায় ব্যক্তি ছিল তাই সে দ্রুত পালাতে পারে নি। অবশেষে তারা যখন আমাদের ধরে ফেলে তখন আমি তাকে বলি, বসে পড় এবং সে বসে পড়ে। আমি তাকে রক্ষা করার জন্য নিজের দেহ দিয়ে তাকে আবৃত করার চেষ্টা করি। কিন্তু তারা আমার দেহের নীচ দিয়ে তার শরীরে তরবারি ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে। তাদের একজনের তরবারি লেগে আমার পাও কেটে যায়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ওকালাহ, হাদীস-২৩০১)

তাবারীর ইতিহাসে এর বিস্তারিত বর্ণনা এভাবে রয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বর্ণনা করেন, "মক্কায় উমাইয়্যা বিন খালফ আমার মিত্র ছিল। তখন আমার নাম আবদে আমর ছিল। মক্কাতেই আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার নাম আব্দুর রহমান রাখা হয়। এরপর মক্কায় যখনই সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করত, বলতো, হে আবদে আমর! তুমি কি তোমার পিতার দেওয়া নাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? আমি বলতাম, হ্যাঁ। তখন সে বলতো, কিন্তু আমি রহমানকে চিনি না। অন্য কোন নাম রাখাই তোমার জন্য সমীচীন হবে, আমি সেই নামেই তোমাকে সম্বোধন করব। কেননা তোমার পূর্বের নামে ডাকলে তুমি আমার ডাকে সাড়া দাও না। আর যে বিষয় সম্পর্কে আমি অনবহিত, সেই নামে আমি তোমাকে ডাকব না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বলেন, সে যখন আমাকে হে আবদে আমর! বলে ডাকতো, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিতাম না। আমি বললাম, হে আবু আলী! নাম তুমি যা চাও নির্ধারণ করে নাও। আমার পুরোনো নামে ডাকলে আমি সাড়া দিব না। সে বলে, ঠিক আছে, তোমার নাম আবদে ইলাহ্ উত্তম হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে। অতএব এরপর যখনই আমার এবং তার সাক্ষাৎ হতো, সে আমাকে আবদে ইলাহ্ নামে সম্বোধন করত আর আমি তাকে উত্তর

দিতাম আর তার সাথে কথা বলতাম, এরই মধ্যে বদরের দিন এসে গেল। আমি উমাইয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম আর সে তার ছেলে আলী বিন উমাইয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার কাছে কয়েকটি বর্ম ছিল, যা আমি হস্তগত করেছিলাম। আমি সেগুলো নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সে আমাকে দেখে ডাক দেয়, হে আবদে আমর! আমি কোন উত্তর দিলাম না। সে বলে, হে আবদে ইলাহ্! আমি বললাম, হ্যাঁ– কি বলবে বল? সে বলে, তুমি যে বর্মগুলো নিয়ে যাচ্ছ আমি কি তোমার কাছে এর চেয়ে উত্তম নই? আমি বললাম, যদি এমনই হয় তাহলে এস, আমি বর্মগুলো সেখানে ফেলে দিই অর্থাৎ তাকে (অর্থাৎ উমাইয়াকে) আশ্রয় দেওয়ার জন্য তার এবং তার পুত্র আলীর হাত ধরি। তখন সে বলে, আজকের মত কঠিন দিন আমি কখনো দেখিনি। যাহোক, তিনি বলেন, আমি উভয়কে নিয়ে রওয়ানা হই। আমি পিতা-পুত্রের মাঝে তাদের উভয়ের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। উমাইয়া আমাকে জিজ্ঞেস করে, হে আবদে ইলাহ্! তোমাদের মধ্যে সে কে, যার বক্ষে চিহ্ন হিসেবে ময়ূরের পাখনা লাগানো ছিল? আমি বললাম, তিনি হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব। সে বলে, তার কারণেই আজ আমাদের এই দুরাবস্থা। যাহোক, তিনি বলেন, আমি তাদেরকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় বেলাল (রা.) তাকে আমার সাথে দেখতে পায়। এই উমাইয়াই মক্কায় হযরত বেলাল (রা.)-কে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিত। প্রচণ্ড রোদে যখন মক্কার পাথর উত্তপ্ত হয়ে যেত তখন সে এর ওপর তাকে সোজা শুইয়ে দিত এবং তার নির্দেশে একটি বড় পাথর তার বক্ষে রেখে দেওয়া হত।এরপর বলত, যতক্ষণ পর্যন্ত তুই মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ না করবি তুই এই শাস্তি ভোগ করতে থাকবি কিন্তু এরূপ কঠিন শাস্তি সত্ত্বেও বেলাল শুধু বলত, 'আহাদ', 'আহাদ' অর্থাৎ, আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক। তাই এখন হযরত বেলাল (রা.) এর দৃষ্টি উমাইয়ার ওপর পড়তেই তিনি বলেন, উমাইয়া বিন খালফ অবিশ্বাসীদের প্রধান। সে যদি (আজ) বেঁচে যায় তাহলে আমি পরিত্রাণ পাব না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, হে বেলাল! এরা দু'জনই আমার বন্দী। বেলাল (রা.) আবারো বলেন, এ যদি বেঁচে যায় তাহলে আমি মুক্তি পেলাম না। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন, হে ইবনে সওদা! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? বেলাল (রা.) পুনরায় বলেন, এ যদি বেঁচে যায় তাহলে আমার রক্ষা নেই। এরপর হযরত বেলাল (রা.) উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, হে আল্লাহ্র আনসার (সাহায্যকারী)! এ হল কাফিরদের নাটের গুরু উমাইয়া বিন খালফ, সে যদি বেঁচে যায় তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। তার এই ধ্বনি শুনে লোকেরা আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে আর অনেকটা বন্দী করে ফেলে আর আমি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে থাকি। একজন তার ছেলের ওপর তরবারি দিয়ে আঘাত করে আর সে ভূপতিত হয়। তখন উমাইয়া এত জোরে চিৎকার করে যে, আমি এমনটি কখনো শুনিনি। আমি তাকে পালাতে বলি কিন্তু সে পালাতেও সক্ষম ছিল না। আমি বললাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার কোন উপকারে আসবো না। এরই মধ্যে আক্রমণকারীরা তাদের উভয়ের ওপর নিজেদের তরবারি দিয়ে আক্রমণ করে আর তাদের উভয়ের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা বেলাল এর ওপর কৃপা করুন। আমার বর্মগুলোও গেল আর জোর করে বন্দীদেরও ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন মানুষ যখন পদস্খলিত হয় তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে অবিচল থাকেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৫)

ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একুশটি আঘাত পান আর তার পায়ে এমন আঘাত পান যে, (এরপর থেকে) তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটতেন আর তার সামনের দু'টি দাঁতও শহীদ হয়ে যায়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৬)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)'র নেতৃত্বে সাতশ' ব্যক্তির সমন্বয়েএকটি বাহিনীকে দুমাতুল জানদাল অভিমূখে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) স্বীয় পবিত্র হস্তে তাঁর মাথায় কালো রঙের পাগড়ী বেঁধে দেন এবং এর শেষপ্রান্ত তার দু'কাঁধের মধ্যখানে রাখেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আবু মুহাম্মদ! দুমাতুল জানদাল থেকে আমি আশঙ্কাজনক সংবাদ পাচ্ছি, মদীনায় আক্রমণ করার জন্য সেখানে সৈন্যবাহিনী সমবেত হচ্ছে। আল্লাহর পথে জিহাদের লক্ষ্যে তুমি সেদিকে যাত্রা কর। তোমার সাথে সাতশত যোদ্ধা যাবে। দুমাতুল জানদাল পৌঁছে সেখানকার নেতা এবং কাল্ব গোত্রকে প্রথমে ইসলামের প্রতি আহ্বান করবে। কিন্তু যদি যুদ্ধ করার মত পরিস্থিতি হয় তাহলে মনে রাখবে, প্রতারণা করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, নারী ও শিশুদের হত্যা করবে না আর খোদাদ্রোহীদের হাত থেকে এই ধরাধামকে পবিত্র করে দিবে। এইসব সাবধানতা অবলম্বনের শর্তে যুদ্ধের অনুমতি আছে। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ দুমাহ্ পৌঁছে স্থানীয় লোকদেরকে তিন দিন পর্যন্ত ইসলামের তবলীগ করেন আর তারা তিন দিন পর্যন্ত অস্বীকার করতে থাকে এরপর আসবাগ বিন আমর কালবী নামে এক খ্রিষ্টান নেতা ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ পুরো বৃত্তান্ত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে লিখে পাঠান। পত্রের উত্তরে তিনি বলেন, সেই নেতার মেয়ে তুমাযেরকে বিয়ে করে নাও। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তাকে বিয়ে করেন এবং তাকে সাথে নিয়ে মদিনা ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তামাযের উম্মে আবু সালমা নামে পরিচিত হন।

(রওশন সিতারে, প্রণেতা- গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৬) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৬)

উমর বিন আব্দুল আযীয বর্ণনা করেন, ১৪ হিজরী সনে জিসরের যুদ্ধের সময় হযরত উমর (রা.) যখন হযরত উবায়েদ বিন মাসউদের শাহাদত বরণের সংবাদ পান (জিসরের যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা হয়েছে, ইরানীদের এক হাতি তাকে পদদলিত করেছিল) এবং যখন জানতে পারেন যে, পারস্যবাসীরা পারস্য বংশোদ্ভুত এক ব্যক্তিকে সন্ধান করে নিজেদের বাদশাহ বানিয়েছে। তখন তিনি মুহাজের ও আনসারদেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন এবং মদিনা থেকে যাত্রা করে সিরার নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করেন। সিরার মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে ইরাক যাওয়ার পথে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। যাহোক, সেখানে তিনি অবস্থান করেন আর হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ কে অগ্রে প্রেরণ করেন যেন তিনি আহফাস পৌঁছে যান। তিনি মায়মানা অর্থাৎ সৈন্য-বাহিনীর ডান বাহুর নেতৃত্বে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ এবং মায়সারা অর্থাৎ বাহিনীর বাম বাহুর নেতৃত্বে হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামকে নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলী (রা.)কে মদিনায় নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে রেখে আসেন। হযরত উমর (রা.) লোকজনের সাথে পরামর্শ করলে সকলেই তাকে পারস্য যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কাফেলা সিরার নামক স্থানে আসা পর্যন্ত হযরত উমর (রা.) কারো সাথে পরামর্শ করেন নি, সেখানে পৌঁছে তিনি পরামর্শ করেছিলেন। হযরত তালহা ফিরে এলে তিনিও একই মত প্রকাশ করেন। প্রথমে হযরত তালহা সেখানে ছিলেন না। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন বললেন, ঠিক আছে, সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত। কিন্তু হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হযরত উমর (রা.)-কে সেখানে যেতে বারণ করেছিলেন। এই বিষয়ে বাধা দেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বলেন, আজকের পূর্বে আমি মহানবী (সা.) ছাড়া আর কারো জন্য নিজের পিতামাতাকে উৎসর্গ করি নি আর ভবিষ্যতেও কখনো করবো না কিন্তু আজ আমি বলছি, হে সেই ব্যক্তি যার প্রতি আমার পিতামাতা নিবেদিত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। তিনি তৎকালীন খলীফা হযরত উমর (রা.)-কে বললেন, আপনি এখানেই তথা সিরার নামক স্থানে অবস্থান করুন আর একটি বিশাল বাহিনী পারস্য অভিমুখে পাঠিয়ে দিন। প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আপনার বাহিনীর বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্ত কী ছিল তা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। আপনার বাহিনী যদি পরাজিত হয় তাহলে তা আপনার পরাজয়ের মত হবে না। শুরুর দিকেই যদি আপনি নিহত হন বা পরাজিত হন তাহলে আমার আশংকা হলো মুসলমানরা কখনও 'তাকবীর' পড়তে পারবে না আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যও দিতে পারবে না। এসব আলোচনা যখন চলছিল তখন হযরত উমর (রা.) বাহিনীর সেনাপতি করে কাকে পাঠানো যায় এমন কাউকে সন্ধান করছিলেন। ঠিক তখনই, হযরত উমরের সকাশে হযরত সা'দের পত্র

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা
ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

আসে। হযরত সা'দ তখন নাজাদের যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর কথা শুনে হযরত উমর বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমাকে এমন কোন ব্যক্তি দেখাও যাকে দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, লোক তো আপনি পেয়ে গেছেন। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কে সে? হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, কুস্তিগীরদের সিংহ সা'দ বিন মালেক। অর্থাৎ তিনি খুবই বাহাদুর এবং উত্তম সেনাপতি,তাকে সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করুন। অন্যরাও এই পরামর্শে সহমত প্রকাশ করেন। এটিও তাবারীর ইতিহাস থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি।

(তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮১-৩৮২) (আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭) (ফারহাঙ্গে সীরাত, প্রণেতা- সৈয়দ ফযলুর রহমান, পৃ: ১৭২, প্রকাশনায়-যোওয়ার একাডেমি, করাচি)

মহানবী (সা.) মদীনায় বিভিন্ন গোত্র ও সাহাবা (রা.) কে বসবাসের জন্য জায়গা প্রদান করেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর গোত্রকে বসবাসের জন্য মসজিদে নববীর পেছনে খেজুর গাছ বেষ্টিত জমি প্রদান করেন। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-কে জায়গীর হিসেবেও জমি প্রদান করেন। হযরত উমর (রা.)-এর বংশধরদের কাছ থেকে হযরত যুবায়ের (রা.) উক্ত জায়গীর ক্রয় করে নেন। মহানবী (সা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ মুসলমানদের হাতে সিরিয়া বিজিত করলে তখন তোমাকে অমুক অংশের জমি দেওয়া হবে। অতএব হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমানরা যখন সিরিয়ায় বিজয় লাভ করে তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে তার জমি প্রদান করা হয়। সেই এলাকার নাম ছিল 'সালিল' যেখানে তাকে (রা.) জমি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

(রওশন সিতারে, প্রণেতা-গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড,পৃ: ১০৫-১০৬)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) এর একটি সৌভাগ্য হলো, মহানবী (সা.) তাঁর ইমামতিতে নামায পড়েছেন। যেমন, হযরত মুগিরা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি তবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত মুগিরা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) ফযরের নামাযের পূর্বে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য যান আর আমি তাঁর সাথে পানির মশক নিয়ে যাই। আমি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, মহানবী (সা.) (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে) আমার কাছে ফিরে আসার পর আমি মশক থেকে তাঁর হাতে পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি (সা.) উভয় হাত তিনবার ধৌত করলেন। এরপর তিনি তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর তিনি তাঁর বাহুদ্বয় জুব্বা থেকে বের করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু জুব্বার হাতা আঁটসাঁট ছিল, যে কারণে তিনি (সা.) তাঁর হাত জুব্বার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে নিজ বাহু জুব্বার নিচ দিয়ে বের করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি (সা.) তাঁর মোজার ওপর মাসাহ্ করে সেগুলো পরিস্কার করলেন। এরপর তিনি (সা.) এগিয়ে গেলেন। মুগিরা (রা.) বলেন, আমিও তাঁর (সা.) পেছনে হাটতে থাকলাম এবং গিয়ে দেখলাম লোকেরা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে নামাযের ইমামতির জন্য দাঁড় করিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ তিনি নামায পড়াচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) দুই রাকাতের মাঝে এক রাকা'ত পেয়েছিলেন অর্থাৎ ততক্ষণে এক রাকা'ত নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং ফযরের নামাযের দ্বিতীয় রাকাত বাকি ছিল। মহানবী (সা.) কাতারে দাঁড়িয়ে লোকদের সাথে দ্বিতীয় রাকা'ত আদায় করলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) যখন সালাম ফেরালেন এবং মহানবী (সা.) প্রথম রাকাত পূর্ণ করার জন্য দাঁড়ালেন তখন এ বিষয়টি মুসলমানদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করল আর তারা অজস্র ধারায় তাসবিহ্ করতে লাগল। মহানবী (সা.) নামায শেষ করার পর লোকদের সম্বোধন করে বললেন, আপনারা ঠিক কাজটিই করেছেন, অথবা বলেন, আপনারা ভালো কাজ করেছেন। যথাসময়ে নামায পড়ার কারণে মহানবী (সা.) তাদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন। হযরত মুগিরা (রা.) বলেন,আমি সেখানে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) কে পিছনে নিয়ে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম কিন্তু মহানবী (সা.) বললেন, থাক! তাকেই নামায পড়াতে দাও। নামাযের পর মহানবী (সা.) বললেন, প্রত্যেক নবীই তার জীবদ্দশায় স্বীয় উম্মতের কোন পুণ্যবান ব্যক্তির ইমামতিতে নামায অবশ্যই আদায় করে থাকেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুস সলাত বাব তাকদীমুল জামাআত..,হাদীস- ২৭৪)

মহানবী (সা.) তাকে আরো একটি মহাসম্মানে ভূষিত করেছেন। শুধু এ কথাই বলেন নি যে, নামায পড়িয়ে খুব ভালো করেছে বরং এও বলেছেন যে, তোমার পিছনে আমার নামায পড়া এ বিষয়ের সত্যায়ন করে যে, তুমি একজন পুণ্যবান মানুষ।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, যোহর নামাযের পূর্বে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) দীর্ঘ নামায পড়তেন অর্থাৎ তিনি নফল নামায পড়তেন। আযান শোনার পরই তিনি নামায পড়ার জন্য (মসজিদে) চলে আসতেন।

(রওশন সিতারে, প্রণেতা-গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৭)

একজন বর্ণনাকরী বলেন, আব্দুর রহমান (রা.) কে আমি কা'বা শরীফ তোয়াফ করতে দেখেছি আর তখন তিনি দোয়া করছিলেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে রক্ষা কর।"

(রওশন সিতারে, প্রণেতা-গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১০)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত হলো, হযরত উমর (রা.) যে বছর খলীফা নির্বাচিত হন সে বছর তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করেন।

(তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৯-৩৮০)

হযরত আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একবার রসূল করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে অতিরিক্ত উকুনে অতিষ্ঠ হওয়া নিয়ে অভিযোগ করেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কি আমাকে রেশমী পোশাক পড়ার অনুমতি দিবেন? (সে যুগে) সাধারণ সুতি কাপড়ের কারণে হয়তো মাথায় উকুন হয়েছিল আর যাচ্ছিল না। তখন তিনি (রা.) রেশমী পোশাক পরিধানের অনুমতি নেন তাতে কিছুটা হলেও রক্ষা হয়। মহানবী (সা.) অনুমতি দিয়ে বলেন, ঠিক আছে পরে নাও। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর যখন হযরত উমর (রা.) খলীফার আসনে সমাসীন হন তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) তাঁর পুত্র আবু সালামা (রা.) কে সাথে নিয়ে হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। ওই সময় আবু সালামা (রা.) রেশমী জামা পরিহিত ছিলেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি কী পরেছ? এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) তার কলারে হাত দিয়ে জামা ছিঁড়ে ফেলেন। এতে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) হযরত উমর (রা.) কে বলেন, আপনি কি জানেন না যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে (রেশমী কাপড় পড়ার) অনুমতি দান করেছিলেন? উত্তরে হযরত উমর (রা.) বলেন, আপনাকে মহানবী (সা.)-এর অনুমতি দেওয়ার কারণ ছিল আপনি তাঁর সমীপে উকুনের অভিযোগ করেছিলেন আর এ অনুমতি আপনি ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৯৬)

সা'দ বিন ইব্রাহীম (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একটি চাদর পরিধান করতেন অথবা কোন এক সময় তিনি একটি চাদর পরিহিত ছিলেন যার মূল্য চারশ কিংবা পাঁচশ দিরহাম ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৯৭)

অর্থাৎ এমন অবস্থা ছিল যখন অনেক দামি পোশাকও তিনি পরিধান করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপা দেখুন! হিজরতের পর তার কাছে কিছুই ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে অনেক মূল্যবান পোশাকও পরিধান করেছেন আর

ইমামের বাণী

তোমাদের জন্য সাহাবাগণের আদর্শ রয়েছে। লক্ষ্য কর, কিভাবে তাঁরা জগত বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)**

ইমামের বাণী

ইসলামকে অনেক দুর্যোগময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। সেই শরৎ অতীত হয়েছে, এখন বসন্ত এসেছে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata**

আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিপুল সম্পত্তির মালিকও বানিয়েছিলেন।

মৃত্যুশয্যায় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে হযরত উমর (রা.) কে মনোনীত করেছিলেন। তিনি যখন এ বিষয়ে মনস্থির করেন তখন তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) কে ডেকে বলেন , উমর সম্পর্কে তোমার মতামত কী? উত্তরে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, হে রসূলের খলীফা! অন্যদের সাথে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি তাঁর সম্পর্কে যে মতামত রাখেন তার চেয়েও তিনি উত্তম কিন্তু তাঁর প্রকৃতিতে কিছুটা কঠোরতা রয়েছে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তার এই কঠোরতার কারণ হলো তিনি আমাকে নমনীয় দেখতেন। আমি অনেক নমনীয় ছিলাম তাই তিনি কিছুটা কঠোর ছিলেন যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, দায়িত্ব যখন তাঁর ওপর ন্যস্ত হবে তখন এধরণের অধিকাংশ বিষয়ই তিনি পরিত্যাগ করবেন। তখন তাঁর মাঝে এ কঠোরতা দেখবে না। এরপর তিনি (রা.) বলেন, হে আবু মুহাম্মদ! আমি তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, আমি যখন কোন বিষয়ে কারো প্রতি রাগান্বিত হতাম তখন উমর আমাকে তার প্রতিই সন্তুষ্ট থাকার পরামর্শ দিতেন। সে সময় হযরত উমর (রা.) নমনীয়তা অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন। কিন্তু আমি যখন কারো প্রতি নমনীয়তা প্রকাশ করতাম তখন তিনি আমাকে তার প্রতি কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিতেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আবু মুহাম্মদ! তোমার সাথে আমি যে আলোচনা করলাম তা যেন আবার কারো কাছে উল্লেখ করো না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, আচ্ছা! ঠিক আছে।

(তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫২)

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) বিভিন্ন দিকে কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)কে বনু জাযীমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। বনু জাযীমা গোত্রের লোকেরা অজ্ঞতার যুগে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) এর পিতা অওফকে এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর চাচা ফাকেহ্ বিন মুগীরাকে হত্যা করেছিল। সেখানে হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে সেই গোত্রের এক ব্যক্তি ভুলবশত খুন হয়ে যায়। বিষয়টি মহানবী (সা.) এর শ্রুতিগোচর হলে তিনি এটি অপছন্দ করেন এবং তিনি (সা.) এর রক্তপণও প্রদান করেন আর হযরত খালিদ (রা.) তাদের কাছ থেকে যা কিছু নিয়েছিলেন সেগুলোর মূল্যও তিনি (সা.) পরিশোধ করেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর এহেন কর্ম সম্পর্কে জানার পর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)তাকে বলেন, তুমি কি তাকে এজন্য হত্যা করেছ যে, তারা তোমার চাচাকে হত্যা করেছিল? প্রত্যুত্তরে হযরত খালিদ (রা.) কঠোর ভাষায় বলেন, তারা তোমার পিতাকেও হত্যা করেছিল। হযরত খালিদ (রা.) আরো বলেন, এই দিনগুলোকে তুমি আরো দীর্ঘায়িত করতে চাও! অর্থাৎ তুমি আমার পূর্বে ঈমান আনাকে পূঁজি করে স্বার্থ অর্জন করতে চাও? অর্থাৎ তুমি প্রাথমিক অবস্থায় ঈমান আনয়নকারী হিসেবে গর্বিত আর আর এজন্যই আমাকে এমনটি বলছ? মহানবী (সা.) এ বিষয়টি অবগত হন, কেননা হযরত খালিদ (রা.) কিছুটা উষ্মা ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এ বিষয়টি জানার পর নবী করীম (সা.) বলেন, আমার সাহাবীদের কিছু বলবে না। কসম সেই সত্তার! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করলেও তা তাদের যৎসামান্য কুরবানীর সমান হতে পারে না। এসব লোক অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

(রওশন সিতারে,প্রণেতা-গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৮-১০৯)
(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৯)

প্রাথমিক যুগের এসব সাহাবীরা সীমাহীন কুরবানী করেছেন, তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভবই নয়। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, সে মুসলমানদের নেতাদেরও নেতা আর তিনি (সা.) আরো বলেন, আব্দুর রহমান আকাশেও আমীন (বিশ্বস্ত) আর পৃথিবীতেও আমীন।'

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৪৬)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তার স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেন অর্থাৎ খুবই খারাপ অবস্থা ছিল আর সে দুঃখেই তার মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে যায়। যাহোক তিনি যখন আরোগ্য লাভ করেন অর্থাৎ যখন স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে তখন তিনি বলেন, আমি অজ্ঞান হওয়ার পর আমার কাছে দুই ব্যক্তি এলো। অর্থাৎ সে সময় যে দৃশ্য আমি দেখলাম তা হলো, দুই ব্যক্তি এলো এবং বলল, চলো পরাক্রমশালী আমীন সত্তার হাতে তোমার বিষয়ে মীমাংসা করাব। এরপর সেই দুজনের সাথে আরো একজন ব্যক্তির সাক্ষাত হল আর সেই ব্যক্তি বলল, তাকে নিয়ে যেও না। কেননা এই ব্যক্তি মায়ের গর্ভ থেকেই সৌভাগ্যবান। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) নিজের সম্পর্কে এই দৃশ্য দেখেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯১)

নওফেল বিন আইয়াস হোযালী বলেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) আমাদের বৈঠকে বসতেন এবং তিনি খুবই ভালো সঙ্গী ছিলেন। একদিন তিনি আমাদেরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি গোসল করে বাইরে এলেন এবং আমাদের সামনে একটি পাত্র নিয়ে এলেন যাতে রুটি ও মাংস ছিল। এরপর হঠাৎ কী হল জানি না, তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুহাম্মদ! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এমন অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন যে তিনি (সা.) এবং তাঁর পরিবার সামান্য যবের রুটিও তৃপ্তি সহকারে খেতে পেতেন না। এরপর তিনি বলেন, আমি জানি না, যে কারণে আমরা ছাড় পেয়েছি তা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক কি না।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯১)

আমাদের যে আজ পর্যন্ত জীবিত থাকার সুযোগ লাভ হয়েছে তা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক নাকি পরীক্ষাস্বরূপ। এই হল সাহাবীদের আবেগ-অনুভূতি,খোদাভীতির দৃষ্টান্ত এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ভালোবাসা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। এই আবেগ-অনুভূতি শুধু মহানবী (স.) এবং তাঁর পরিবার পরিজন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সাহাবীদের পরস্পরের মাঝে যে অতুলনীয় ভালোবাসা ছিল তারও বহিঃপ্রকাশ ঘটত। এ প্রসঙ্গেই হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। একদিন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর কাছে ইফতারের সময় খাবার আনা হল। দস্তরখানে হরেক রকমের সুস্বাদু খাবার শোভা পাচ্ছিল। সেখান থেকে হযরত আব্দুর রহমান (রা.) এক গ্রাস মুখে দেন। হরেক রকমের খাবার এসেছে আর তা থেকে তিনি খাওয়ার জন্য এক গ্রাস নিলেন এবং সেই খাবার মুখে নিতেই তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন আর একথা বলে খাবার থেকে হাত সরিয়ে নিলেন যে, মুসআব বিন উমায়ের (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। তিনি আমাদের চাইতে উত্তম ছিলেন। তাঁর গায়ের চাদরই তাঁর কাফন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কাফনের জন্য কাপড় ছিলনা, তাই যে চাদর পরিহিত ছিলেন সেটি দিয়েই কাফন দেওয়া হয়। সেই কাফনও কেমন ছিল! পা ঢাকলে মাথা অনাবৃত হয়ে যেত আর মাথা ঢাকলে পা অনাবৃত হয়ে যেত। এরপর হযরত আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, হামযা শহীদ হয়েছেন তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু আমাদেরকে সম্পদের প্রাচুর্য্য ও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দান করা হয়েছে এবং আমরা এ থেকে বিপুল অংশ পেয়েছি। আমার আশংকা হয় যে, হয়ত আমাদের পুণ্যের প্রতিদান আমরা এ পৃথিবীতেই পেয়ে গেছি! এরপর তিনি কাঁদতে থাকেন এবং খাবার ছেড়ে উঠে যান। আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে তারা এরূপ ভীত ছিলেন। (রওশন সিতারে, প্রণেতা-গোলাম বারি সাঈফ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১১-১১২)

যুগ খলীফার বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষা আসে, ঈমান কোন মূল্য রাখে না। অনেক মানুষ আছে, পরীক্ষার সময় যাদের পদস্খলন ঘটে এবং কষ্টের সময় ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Asyea Khatun, Harhari, Murshidabad

ইমামের বাণী

আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সিড়ি হল নামায। যৌবনকালের ইবাদত খোদা তা'লার নিকট বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রাখে।

(২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর কাছে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ আসেন এবং বলেন, হে আমার মা! আমার আশঙ্কা হয় যে, প্রাচুর্য আমাকে ধ্বংস না করে দেয়, কেননা আমি কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি উত্তর দেন, (হে আমার) পুত্র! খরচ কর, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, তাহলে ধ্বংসের কোন প্রশ্ন আসবে না, কেননা আমি মহানবী (সা.)-কে এটি বলতে শুনেছি যে, আমার কিছু সাথী এমনও হবে যাদের সাথে আমার বিচ্ছেদের পর পুনরায় তারা কখনো আমাকে দেখবে না। অর্থাৎ কিছু লোক এমন হবে যারা সেই পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ যখন বাইরে বের হন, পথিমধ্যে হযরত উমরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি হযরত উমরকে একথা বললে হযরত উমর স্বয়ং হযরত উম্মে সালামার কাছে যান এবং বলেন, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি আমাকে বলুন, আমি কি ঐসকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, তারা আমার সাথে মিলিত হবে না। অর্থাৎ যারা মহানবী (সা.)-কে পুনরায় দেখতে পাবে না, আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? হযরত উম্মে সালামা হযরত উমরকে বলেন যে, না, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কিন্তু আপনার পরে কারো সম্পর্কে আমি একথা বলতে পারি না যে, তারা মহানবী (সা.)-কে দেখতে পাবে কি-না।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব,২য় খণ্ড,পৃ: ৮৪৮-৮৪৯)

অর্থাৎ কারো বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, মহানবী (সা.)-কে তারা অবশ্যই দেখবে। কিন্তু এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত, যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তাদের একজন ছিলেন যারা আশারায়ে মুবাশ্বেরার অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে মহানবী (সা.)জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মাঝে খোদা তা'লার ভয় এবং ভীতি এত বেশি ছিল যে, তারা সর্বদা বিচলিত থাকতেন। হযরত উম্মে সালামার এই কথা শোনার পরও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনেক বেশি দান-খয়রাত করেন।

একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন, হযরত উমর যখন সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন আর 'সারগু' নামক স্থানে পৌঁছেন- 'সারাখ' হলো সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত তবুক উপত্যকার একটি গ্রামের নাম, যা মদিনা থেকে তেরো রাতের দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ সেই সময় বাহনের যে ব্যবস্থা ছিল, (সে হিসেব অনুসারে) তেরো রাত পর্যন্ত অনবরত সফরে অতিক্রান্ত দূরত্বের সমান দূরত্বে ছিল সেটি- সেখানে পৌঁছে সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ ও তার সঙ্গীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই ঘটনাটি আঠারো হিজরী সনে হযরত উমরের খিলাফতকালে সিরিয়া বিজয়ের পরের। তারা হযরত উমরকে বলেন যে, সিরিয়ায় প্লেগ-মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) বলেন,পরামর্শের জন্য প্রথম যুগের মুহাজেরদেরকে আমার কাছে ডাক, অর্থাৎ শুরুর দিকের মুহাজেরদের ডাক, দেখা যাক তারা কী পরার্মশ দেয়। হযরত উমর (রা.) তাদের সাথে পরার্মশ করেন,কিন্তু মুহাজেরদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। কারো কারো মত ছিল এটি থেকে পিছু হটা উচিত নয়, অর্থাৎ এই সফর অব্যাহত রাখা উচিত, আর কেউ কেউ বললো, এই বাহিনীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাহাবীরাও রয়েছেন। তাদেরকে এই মহামারির মুখে ঠেলে দেওয়া ঠিক হবে না, ফিরে যাওয়া-ই উত্তম হবে। হযরত উমর (রা.) মুহাজেরদের ফেরত পাঠিয়ে আনসারদেরকে পরামর্শের জন্য ডাকেন আর তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেন। কিন্তু আনসারদের মাঝেও মুহাজেরদের মতো মতভেদ দেখা দেয়, অর্থাৎ কেউ কেউ বললো ফিরে যান আর কেউ কেউ বললো এগিয়ে চলুন। হযরত উমর (রা.) আনসারদেরকে (ফেরত) পাঠিয়ে বলেন, কুরাইশদের বয়োবৃদ্ধদের ডাক। কুরাইশদের সেই সমস্ত বয়োবৃদ্ধদের ডাক যারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় এসেছে। তাদেরকে ডাকা হলে তারা সবাই সমস্বরে পরার্মশ দেন যে, এদের সবাইকে সাথে নিয়ে ফিরে যান, যেখানে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, আর মহামারিকবলিত এলাকায় লোকজনকে নিয়ে যাবেন না। হযরত উমর (রা.) তাদের পরামর্শ মেনে নিয়ে মানুষের মাঝে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দেন। হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ (রা.) সেই সময় প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্‌র তক্বদীর থেকে কি পলায়ন সম্ভব? আপনি এই মহামারির ভয়ে ফিরে যাচ্ছেন, মহামারি ছড়িয়ে আছে, এটিতো আল্লাহ্‌র তকদীর। এর থেকে আপনি পালাতে পারবেন কি? হযরত উমর (রা.) তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেন, হে আবু উবায়দা! হায়, তুমি ছাড়া যদি অন্য কেউ এই কথা বলতো। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র এক তকদীর থেকে পালিয়ে আল্লাহ্‌রই অন্য এক তকদীরের দিকে যাচ্ছি। এরপর হযরত উমর (রা.) তাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝান যে, আল্লাহ্‌র তকদীর কী, তিনি বলেন, তোমার কাছে যদি (এক পাল) উট থাকে আর তুমি সেগুলো নিয়ে এমন এক উপত্যকায় নাম যার দু'টি প্রান্ত। একটি সবুজ-শ্যামল এবং অন্যটি শুষ্ক। তুমি যদি তোমার উটগুলোকে সবুজ-শ্যামল স্থানে চরাও তবে তা আল্লাহ্ তা'লার তক্বদীর আর তুমি যদি সেগুলোকে শুষ্ক স্থানে চরাও তবে সেটিও আল্লাহ্ তা'লারই তক্বদীর। ঐশী তক্বদীরএখানে তোমাকে দু'টি রাস্তা দিয়েছে। একটি সবুজ-সতেজ জায়গা আর অন্যটি সম্পূর্ণ শুষ্ক, অনুর্বর ভূমি, যেখানে কদাচিৎ ঝোপঝাড় রয়েছে বা অতি সামান্য পরিমাণ ঘাস রয়েছে। এখন তুমি যদি বল, এই সবুজ ঘাস নিজ তকদীর অনুযায়ী হয়েছে আর শুষ্ক ভূমি হলো অন্য কোন তকদীরের ফলাফল! (জেনে রাখ) দু'টিই আল্লাহ্ তা'লার তক্বদীর। এখন তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তুমি কোনটি গ্রহণ করবে। জানা কথা যে, তুমি সবুজ-সতেজ স্থানেই চরাবে। রেওয়ায়েতকারী বর্ণনা করেন যে, এই কথাগুলো হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন। ইতিমধ্যে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)ও চলে আসেন, যিনি পূর্বে ব্যক্তিগত কোন ব্যস্ততার কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি (রা.) বলেন, আমার কাছে এই সমস্যার সমাধান আছে। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, আপনি লোকজনের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করছেন, আমি আপনাকে বলছি, কেননা এটি আমার জানা আছে। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এটি বলতে শুনেছি যে, তোমরা যদি কোন স্থানে মহামারির প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাও; তাহলে সেখানে যেও না। আর মহামারী যদি তোমাদের বসতিস্থলে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে বাইরে বের হবে না। অর্থাৎ যেখানে মহামারি ছড়িয়ে আছে সেখানে যাবে না আর যে এলাকায় বসবাস কর সেখানে মহামারি দেখা দিলে সেস্থান থেকে বাইরে যেও না, বরং সেখানেই অবস্থান কর, যেন সেই রোগ বা মহামারি অন্যদের মাঝে সংক্রমিত না হয়।

আজ গোটা বিশ্ব লকডাউনের এই বিধি মেনে চলছে। যারা সময় মতো লকডাউন করেছে তারা এই রোগকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। আর যেখানে তা করতে পারে নি, বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে সেখানে এটি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। যাহোক, মৌলিক এই বিষয়টি মহানবী (সা.) শুরুতেই নিজ সাহাবীদেরকে অবগত করেছিলেন। তখন হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করে সেখানে থেকে ফিরে যান।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তিব,হাদীস-৫৭২৯)

হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন সুস্থ ছিলেন তখন তার কাছে নিবেদন করা হতো যে, আপনি কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করতেন। অতঃপর একদিন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে কিছু কথা ব্যাখ্যা করেন আর বলেন, আমি যদি মৃত্যু বরণ করি তাহলে তোমাদের বিষয়টি এই ছয় ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত হবে যারা মহানবী (সা.)-কে এই অবস্থায় বিদায় জানিয়েছেন যে, তিনি (সা.) তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত আলী বিন আবু তালেব এবং তার দৃষ্টান্ত হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ এবং তার

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং বা-জামাত নামায পড়ার চেষ্টা করুন। এটি এমন আশিসময় ইবাদত যা বান্দার সঙ্গে স্রষ্টার মিলন সাধন করে। (২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

দৃষ্টান্ত হযরত উসমান বিন আফফান আর হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ এবং তার দৃষ্টান্ত হযরত সাদ বিন মালেক। তিনি বলেন, সাবধান! আমি তোমাদের সবাইকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন আর বণ্টনের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের আদেশ দিচ্ছি। আবু জা'ফর বলেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) শূরার সদস্যদের বলেন, তোমরা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ কর, অতঃপর যদি দু'জন দু'জনের (তিনটি ভিন্ন মত) হয় তাহলে পুনরায় পরামর্শ কর। আর যদি চার জন আর দুই জন হয় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে গ্রহণ কর। যায়েদ বিন আসলাম তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) বলেন, যদি তাদের মত তিন তিনজনে বিভক্ত হয় তাহলে যেদিকে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ থাকবেন সেদিকের লোকদের কথা গ্রহণ কর এবং আনুগত্য কর।

আব্দুর রহমান বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) যখন আহত হন তখন তিনি বলেন, সুহায়েব তোমাদেরকে নামায পড়াবেন, অর্থাৎ হযরত সুহায়েব (রা.)-কে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন, আর এই কথা তিনি তিনবার বলেন। তোমরা নিজেদের এ বিষয়ে পরামর্শ কর আর এই বিষয়টি সেই ছয় ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকবে। আর যে ব্যক্তি তোমাদের নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তোমাদের বিরোধিতা করে, তার শিরোচ্ছেদ কর। অর্থাৎ যখন পরবর্তী খিলাফতের নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে তখন এই ছয় ব্যক্তির ওপর (নির্বাচনের দায়িত্ব) থাকবে। ততদিন হযরত সুহায়েব নামাযের ইমাম হবেন। হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা.) মৃত্যুর স্বল্পক্ষণ পূর্বে হযরত আবু তালহার কাছে বার্তা পাঠান এবং বলেন, হে আবু তালহা! তুমি নিজের জাতির আনসারদের ৫০জন ব্যক্তিকে নিয়ে সেই শূরা-সদস্যদের কাছে যাও আর তাদেরকে ৩ দিন পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের মাঝ থেকে কাউকে আমীর হিসেবে নিযুক্ত না করে নেয়। হে আল্লাহ্! তুমি তাদের ওপর আমার খলীফা।

ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা তার সাথীদেরকে নিয়ে কিছুক্ষণ হযরত উমরের কবরে দাঁড়ান, এরপর শূরার সদস্যদের সাথে অবস্থান করেন। অতঃপর শূরার সদস্যরা নিজেদের বিষয়টি এ মর্মে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর হাতে ন্যস্ত করেন যে, তিনি যাকে ইচ্ছা আমীর নিযুক্ত করার অধিকার রাখেন। তখন হযরত আবু তালহা তার সাথীদেরকে নিয়ে হযরত উসমানের হাতে বয়আত না করা পর্যন্ত হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর ঘরের দরজায় দণ্ডায়মান থাকেন।

হযরত সালামা বিন আবু সালমা নিজ পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ হযরত উসমানের হাতে বয়আত করেন। এরপর হযরত আলী (রা.) বয়আত করেন। হযরত উমরের মুক্ত কৃতদাস উমর বিন উমায়রা তার দাদার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আলী হযরত উসমানের হাতে বয়আত করেন; এরপর বাকি সবাই বয়আত করেন। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪-৪৬)

বুখারীর একটি রেওয়ায়েত এটিও রয়েছে যে, হযরত উমর (রা.) যখন আল্লাহু আকবার বলে নামায পড়ানোর জন্য দণ্ডায়মান হন তখন নামাযের শুরুতেই তার ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ হয়, তখন আহত অবস্থায় হযরত উমর তাঁর নিকটেই দণ্ডায়মান হযরত আবদুর রহমার বিন অওফ-এর হাত ধরে তাকে ইমামতির জন্য সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তখন সংক্ষিপ্ত নামায পড়ান।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৭০০)

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের নির্বাচনের সময় হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, পূর্বেও দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর সাথে শুধুমাত্র এক স্থানে মতভেদ রয়েছে, এছাড়া বাকি কথা একই। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) যখন আহত হন এবং বুঝতে পারেন যে, তার অন্তিম সময় সন্নিকটে, তখন তিনি ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে ওসীয়্যত করেন যে, তারা যেন নিজেদের মাঝ থেকে কাউকে খলীফা নির্বাচন করে নেয়। সেই ছয় ব্যক্তি ছিলেন– হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত সাদ বিন ওয়াক্কাস (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.) ও হযরত তালহা (রা.)। একইসাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-কেও তিনি তাদের পরামর্শে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারণ করেন, কিন্তু (তাকে) খিলাফতের যোগ্য বলে আখ্যা দেননি। তিনি এই ওসীয়্যত করেন যে, তারা যেন তিন দিনের মাঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর এই তিন দিনের জন্য হযরত সুহায়েবকে নামাযের ইমাম নির্ধারণ করেন। আর পরামর্শ সভার সার্বিক দেখাশোনা করার দায়িত্ব তিনি হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদের ওপর ন্যস্ত করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করেন, আর নিজে তরবারি হাতে দরজায় প্রহরা দেন।

পূর্বের রেওয়ায়েত সমূহে হযরত তালহার উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি (রা.) বিভিন্ন স্থান থেকে নিজে যে ফলাফল বের করেছেন তা হলো, হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদকে খিলাফতের নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত প্রহরা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হযরত উমর (রা.) বলেন, যার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতৈক্য থাকবে, সবাই যেন তার হাতে বয়আত করে। কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা কর, কিন্তু যদি উভয় পক্ষে তিনজন থাকে তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) তাদের মাঝে যার পক্ষে মত দেন তিনিই খলীফা হবেন। যদি সবাই এই সিদ্বান্তে সম্মত না হয়, তাহলে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ যার পক্ষে থাকবেন তিনি খলীফা হবেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর মতে হযরত তালহা তখন মদিনায় ছিলেন না, এ কারণে পরামর্শ সভায় পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, অবশেষে পাঁচজন সাহাবী পরামর্শ করেন। হযরত তালহা ছাড়া বাকি যে পাঁচজন ছিলেন, তারা পরামর্শ করেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ আলোচনার পর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বলেন, ঠিক আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় নাম প্রত্যাহার করতে চায়, বলুক। সবাই যখন নিশ্চুপ থাকেন তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ বলেন, সর্বপ্রথম আমি আমার নাম প্রত্যাহার করছি। এরপর হযরত উসমানও তাই বলেন, এরপর বাকি দু'জন আর হযরত আলী নিশ্চুপ ছিলেন। অবশেষে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ এর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ছাড় দেবেন না। তিনি অঙ্গীকার করলে সব কাজ তাঁর ওপর অর্পিত হয়। অর্থাৎ, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ যে সিদ্ধান্ত দিবেন তাতে কোন ছাড় বা পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। তিনি যখন অঙ্গীকার করেন তখন সব কাজ হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর ওপর ন্যস্ত হয়। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) তিন দিন পর্যন্ত মদিনার ঘরে ঘরে যান এবং নারী-পুরুষ সবাইকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কার খলীফা হওয়ার পক্ষে? সবাই এ কথাই বলে যে, তারা হযরত উসমান (রা.)-এর খলীফা হওয়ার পক্ষে। সুতরাং তিনি হযরত উসমানের পক্ষে নিজের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং তিনি খলীফা নিযুক্ত হন।

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৪৮৪-৪৮৫)

এর আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যা অনেক দীর্ঘ। সেটি ইনশাআল্লাহ্ হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর অবশিষ্ট স্মৃতিচারণে বর্ণিত হবে। আর প্রয়োজন হলে তা পরবর্তীতে পৃথকভাবেও বর্ণিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। অথবা হতে পারে সেই দীর্ঘ রেওয়ায়েতটি আমার মনে হয় হযরত উসমানের খিলাফতের বিষয়ে অথবা হযরত উমরের জীবনী নিয়ে আলোচনার সময়ও বর্ণিত হতে পারে। যাহোক, তাসত্ত্বেও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-এর জীবনের ঘটনাবলীর কিছু এখনও বাকী আছে,তাঁর পুণ্যকাজ ও তাঁর জীবনী সম্পর্কিতকিছু কথা এখনও রয়ে গেছে, তা ইনশাআল্লাহ্তা'লা পরবর্তী খুতবায় বর্ণিত হবে।

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সমস্ত কর্মের পরিণাম নির্ভর করে নিয়ত বা সংকল্পের উপর। প্রত্যেক মানুষ এই নিয়ত বা সংকল্প অনুযায়ীই প্রতিদান পেয়ে থাকে।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়াননুযুর)

দোয়াপ্রার্থী: Jaan Mohammad Sarkar & Family, Keshabpur,MSD.

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

শেষের পাতার পর.....

দিয়ে বলি, রসূল করীম (সা.) -এর মর্যাদা উচ্চতর। একথা শুনে তিনি (সা.) তাঁর সেই নৈকট্যভাজন সাহাবীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, এই ইহুদীর সঙ্গে তোমার বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত হয় নি। বরং তার ধর্মীয় ভাবাবেগের প্রতি তোমার শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত ছিল। এই ছিল তাঁর অনন্য শিক্ষা। আমার মতে এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভালবাসা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার প্রাথমিক নীতিকে বর্তমান যুগে তথাকথিত স্বাধীনতা এবং বিনোদনের নামে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে, এমনকি বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তকদেরকেও হাসি-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করা থেকে ছাড় দেওয়া হয় নি। যদিও আম্বিয়াগণের নিয়ে এইসব হাসিঠাট্টা এঁদের কোটি কোটি অনুগামীদের দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ হয়। অপরদিকে কুরআন করীম এতদূর পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছে যে অপরের প্রতিমাদেরও মন্দ বলো না, কেননা এতে তারা ব্যথিত হবে। এছাড়া এতে তারা তোমাদের খোদাকেও গালমন্দ করবে এবং পরিণামে সমাজের শান্তি ও ঐক্য বিঘ্নিত হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে রসূল করীম (সা.) বিভিন্ন প্রকল্প আরম্ভ করেছিলেন যাতে তাদের জীবনযাপনের মান উন্নত হয় এবং তারা প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত না হয়। তিনি বলেন, মানুষ প্রায় এমন মানুষদের সম্মান ও মর্যাদা দেয় যারা ধনী ও শক্তিশালী। কিন্তু একজন দরিদ্র অথচ চরিত্রবান ও বিনয়ী ব্যক্তি সেই ধনী ব্যক্তির চেয়ে অনেক গুণ শ্রেয়, যে অন্যের ভাবাবেগের প্রতি যত্নবান নয়, কেবল নিজের জন্যই ভাবিত থাকে।

ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও রসূল করীম (সা.) যত্নবান থাকতেন যে অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের ভাবাবেগ যেন আহত না হয়। যেমন, তিনি মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে নিজেদের সমাবেশ ও ভোজের নেমন্তন্নে সবসময় দরিদ্র ও অভাবীদেরকে আমন্ত্রিত করবে। যদি ধনী ও শক্তিশালীরা দরিদ্রদের শোষন করত, তবে তিনি তাঁর সাহাবাদের বলতেন যে তারা যেন দুর্বলদেরকে সুবিচার পেতে তাদের সহায়তা করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন- রসূল করীম (সা.) সব সময় ক্রীতদাস প্রথার অবসানের চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের বারংবার ক্রীতদাসদের মুক্ত করে দেওয়ার উপদেশ দান করেছেন। তিনি বলেন, যদি তারা তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে না পারে, তবে অন্ততপক্ষে তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের বিষয়ে যেন ততটাই যত্নবান থাকে যেমনটি নিজেদের বিষয়ে থাকে।

আরও একটি বিষয় যা প্রায় উঠে আসে তা হল মহিলাদের অধিকার। অর্থাৎ আপত্তি করা হয় যে ইসলাম নাকি মহিলাদের অধিকার প্রদান করে না। এই অভিযোগের সঙ্গে বাস্তবের যোগসূত্র নেই। বরং ইসলামই সর্বপ্রথম মহিলা ও যুবতীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, সেই যুগে যখন কিনা মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত, তাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হত, ইসলামের পয়গম্বর নিজ অনুসারীদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন মহিলাদের শিক্ষা ও সম্মান দানের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করেন। এমনকি এও বলেন যে যদি কারো তিনটি মেয়ে থাকে আর সে তাদেরকে লেখাপড়া শেখায়, সঠিক পথে পরিচালনা করে তবে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে। এমন কথা সেই সব চরমপন্থীদের দাবির বিপরীত যারা বলে, জিহাদ এবং অমুসলিমদেরকে হত্যা করে মানুষ জান্নাতে যাবে। ইসলামের পয়গম্বর এই শিক্ষা দান করেছেন যে মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখানো এবং নৈতিক মূল্যবোধের পাঠ দেওয়াই হল জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার পথ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সব শিক্ষার ভিত্তিতেই বিশ্ব জুড়ে আহমদী মুসলমান মেয়েদেরকে শিক্ষাদান করা হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা উচ্চমানের পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত। আমাদের মেয়েরা চিকিৎসক, শিক্ষিকা, আর্কিটেক্ট হয়ে বিভিন্ন কাজে রত এবং আরও অন্যান্য বিভাগে যুক্ত হচ্ছে আর এভাবে তারা মানবতার সেবায় নিয়োজিত। আমরা এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করি যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ে যেন সমান শিক্ষার সুযোগ পায়। তাই পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আহমদী মেয়েদের শিক্ষার হার কমপক্ষে ৯৯ শতাংশ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতঃপর রসূল করীম (সা.) প্রতিবেশীদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবেশীদের অধিকারের এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে আমার মনে হয়েছে হয়তো তাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করা হবে। তিনি জাতি ও বর্ণের উর্দ্ধে বিশ্বজনীন মানবাধিকারের ভিত্তি রচনা করেছেন। আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি যে কিভাবে রসূল করীম (সা.) শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধের পর এর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মুসলমানেরা সাজসরঞ্জামহীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে পুষ্ট হয়ে নিজেদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী মক্কাবাসীদেরকে পরাস্ত করেছিল। এরপর রসূল করীম (সা.) শিক্ষিত যুদ্ধবন্দীদেরকে এই শর্তে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন তারা সমাজের অশিক্ষিত মানুষদের লেখাপড়া শিখিয়ে দিবে। কাজেই এভাবে কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইসলামের পয়গম্বর বন্দীদের সংশোধন এবং তাদেরকে সমাজের জন্য উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলার সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রায় এই আপত্তি তোলা হয় যেয ইসলাম যুদ্ধ-বিগ্রহের ধর্ম, কিন্তু বাস্তব সেটাই যা কুরআন করীমেও বর্ণিত হয়েছে যে মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি কেবল এই কারণে দেওয়া হয়েছিল যাতে সমগ্র মানবজাতির জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর অধিকার সুরক্ষিত হয়। কুরআন করীম বর্ণনা করে যে যদি মুসলমানেরা মক্কার কাফেরদেরকে প্রতিহত না করত, তবে কোন সীনাগগ, গির্জাঘর, মসজিদ কিম্বা মন্দির বা অন্য কোন ধর্মের উপাসনাগার নিরাপদ থাকত না। কেননা বিরুদ্ধবাদীরা সমস্ত ধর্মের মূল উৎপাটন করতে উদ্যত হয়েছিল। বস্তুত, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা কেবল প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেছিলেন আর সেগুলি ছিল দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন জীবনযাপনের অধিকার রক্ষার লড়াই। বর্তমান যুগে কিছু এমন মুসলমান রয়েছে যারা উগ্রবাদের কৌশল অবলম্বন করে বা যুদ্ধ-বিগ্রহের শিক্ষা দেয়। এর কারণ হল তারা ইসলামী শিক্ষাকে ভুলে বসেছে কিম্বা এ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। মুষ্টিমেয় মানুষ বা সংগঠনগুলি যে সন্ত্রাস প্রদর্শন করছে, সে যেখানেই হোক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য হল শক্তি ও সম্পদ অর্জন করা। অনুরূপভাবে যে সমস্ত দেশ ন্যয় বিবর্জিত ও চরমপন্থার নীতি অবলম্বন করছে, তাদের এমন আচরণের মূলে রয়েছে ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ এবং পেশিশক্তির আস্ফালন। ইসলামের সঙ্গে তাদের আচরণের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম মুসলমানদেরকে বিবাদ-বিশৃঙ্খলা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে। এই কারণেই রসুলু করীম (সা.) কিম্বা তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন কেউই যুদ্ধের জন্য প্রথমে পদক্ষেপ করেন নি, বরং তাঁরা সবসময় শান্তি ও মীমাংসার অভিলাষী থেকেছেন, আর এই পথে তাঁরা অসংখ্য ত্যাগস্বীকারও করেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিছু নিন্দুকদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগও আরোপ করা হয় যে ইসলাম একটি প্রাচীনপন্থী এবং অনগ্রসর ধর্ম অর্থাৎ এমন এক ধর্ম যা উন্মুক্ত চিন্তাধারার বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এমন চিন্তা নির্বুদ্ধিতা ও পক্ষপাতদুষ্টতার পরিচায়ক যা সত্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে কল্পকাহিনীর উপর ভিত্তি করে। এটি এক ভিত্তিহীন অভিযোগ। কুরআন করীম নিজে থেকেই 'হে আমার প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর'-এই দোয়া শিখিয়ে শিক্ষার গুরুত্ব স্পষ্ট করেছে। এই দোয়া একদিকে যেমন মুসলমানদের জন্য সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যম, অপরদিকে এটি মুসলমানদেরকে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি করতে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত মধ্যযুগের মুসলমান চিন্তাবিদ, দার্শনিক এবং উদ্ভাবকদের গবেষণা কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত। (ক্রমশ....)

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্ তা'লার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি জীবনে এগুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবে এবং এর বিকাশস্থল হওয়ার চেষ্টা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

যুগ ইমাম-এর বাণী

স্মরণ রেখো! পাপাচার ও দুরাচার উপদেশ কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে দূর হওয়ার নয়। দোয়াই হল এর একমাত্র পন্থা। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩২)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

২ পাতার পর.....

কিছুকাল পূর্বেই মুসলমানদের সন্তানদের পর্যন্ত খাদ্য ও পানি বন্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সাঃ) বিষয়টি উপেক্ষা করে শত্রুপক্ষের সৈন্যদেরকে সেই জলাধার থেকে পানি নিতে বাধা দেন নি যার উপর আঁ হযরত (সাঃ) এর অধিকার ছিল। কেননা এটা অনৈতিক কর্ম ছিল। ইসলামের উপর সব থেকে বড় আপত্তি এটাই করা হয় যে ইসলাম অস্ত্রবলে প্রসার লাভ করেছে। এরা যারা পানি নিতে এসেছিল তাদের বিরুদ্ধে এই মর্মে বলপ্রয়োগও করা যেতে পারত যে পানি নিতে হলে আমাদের শর্তাবলী মানতে হবে। কুফ্ফার কয়েকটি যুদ্ধে এরকমই করতে থাকে। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) এরূপ বলেননি। এখানে বলা যেতে পারত যে এই সময় মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ শক্তি ছিলনা , দুর্বল ছিল। এই কারণে হয়তো যুদ্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা এই অনুগ্রহ করার চেষ্টা করেছে। যদিও এটা ভুল কথা। মুসলমানদের শিশুরা পর্যন্ত জানত যে মক্কার কাফেররা মুসলমানদের রক্তের পিপাসু। এবং মুসলমানদের মুখ দেখলেই তাদের চোখ রক্তিম হয়ে ওঠে। এই কারণে এই সুখস্বপ্ন কেউ লালন করত না। আর আঁ হযরত (সাঃ) এর এই ধরণের সুধারণা পোষণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। তাঁর মূর্তমান করুণাই ছিল তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড এবং এই সহমর্মিতাপূর্ণ আচরণের চালিকাশক্তি, আর এর মূলে ছিল মানবীয় মূল্যবোধকে রক্ষা করার তাগিদ। কেননা এই মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরই (সাঃ)।

এর পরে ইসলামের এই শত্রুর ঘটনা দেখুন। যার হত্যার পরোয়ানা জারি হয়ে গিয়েছিল, এমন ব্যক্তিকে আঁ হযরত (সাঃ) কেবল ক্ষমা প্রদানই করেন নি, বরং মুসলমানদের মধ্যে বসবাস করে তাকে স্বধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অনুমতিও প্রদান করলেন। সুতরাং এই ঘটনার উল্লেখ এইরূপ পাওয়া যায় যে,

আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা পিতার মত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে আজীবন যুদ্ধ করতে থেকেছে। মক্কা বিজয়ের সময়ও রসুল করীম (সাঃ) এর ক্ষমা ও নিরাপত্তা ঘোষণা সত্ত্বেও একটি সৈন্য দলের উপর আক্রমণ চালায়। এবং 'হারাম'(নিষিদ্ধ স্থান) এ রক্তপাত ঘটায়। নিজের যুদ্ধাপরাধের কারণেই সে হত্যাযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের সামনে সেই সময় কেউ দাঁড়াতে পারেনি। এই কারণে মক্কা বিজয়ের পর প্রাণ রক্ষা করতে সে ইয়েমেনের দিকে পলায়ন করে। তার স্ত্রী রসুলে করীম (সাঃ) এর নিকট তার ক্ষমা প্রার্থী হলে তিনি (সাঃ) অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে তাকে ক্ষমা প্রদান করেন। এবং এর পর সে যখন তার স্বামীকে নিয়ে আসতে নিজে সেখানে গেল তখন আকরামা নিজের এই ক্ষমা প্রাপ্তির কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না, একথা ভেবে যে, "আমি এত অত্যাচার করেছি, এত সংখ্যক মুসলমানদেরকে হত্যা করেছি, শেষ দিন পর্যন্ত আমি লড়তে থেকেছি, তবে আমি কিভাবে ক্ষমা পেতে পারি?" যাই হোক সে কোনো উপায়ে আশ্বস্ত করে তার স্বামী ইকরামাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সুতরাং যখন ইকরামা ফিরে এসে আঁ হযরত(সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হল, এবং এই বিষয়ের সত্যতা জানত চাইল, তখন আঁ হযরত (সাঃ) তার সঙ্গে আশ্চর্য্যজনক করুনার আচরণ করলেন। প্রথমত তিনি (সাঃ) শত্রুদের সর্দারের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন। কেননা সে শত্রুদের সর্দার তাই এর সম্মান করা উচিৎ। এই কারণে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ইকরামা জিজ্ঞাসা করায় তিনি (সাঃ) বললেন যে সত্যিই তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(মোতা ইমাম মালেক, কিতাবুন নিকাহ,)

ইকরামা জিজ্ঞাসা করল যে নিজের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে? অর্থাৎ আমি মুসলমান হইনি। এই শিরকে লিপ্ত অবস্থায় আপনি কি আমাকে ক্ষমা করেছেন ? প্রত্যুত্তরে আঁ হযরত(সাঃ) বললেন, " হ্যাঁ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" তখন ইকরামার হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হল এবং অবলীলায় বলে উঠল , " হে মুহম্মদ (সাঃ) আপনি প্রকৃতই অত্যন্ত দয়ালু, মর্যাদাবান ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী।" রসুলে করীম (সাঃ) এর সদাচার ও অনুগ্রহে আভিভুত হয়ে আকরামা মুসলমান হয়ে গেল।

(আল সীরাতুল হালবিয়া, তৃতীয় খন্ড)

অতএব ইসলাম প্রসার লাভ করেছে উত্তম শিষ্টাচার, অভিব্যক্তি ও ধর্মের স্বাধীনতা প্রকাশের অনুমোদনের মাধ্যমে । চারিত্রিক সৌন্দর্য ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অব্যর্থ এই অস্ত্র ইকরামার মত ব্যক্তিকে নিমেষের মধ্যে আহত করে ফেলল। আঁ হযরত (সাঃ) ক্রীতদাসদেরকে পর্যন্ত এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে , তারা ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামের প্রচার এজন্য করা হয় কেননা এটা আল্লাহ তায়ালার আদেশ। তিনি আদেশ করেছেন যে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে লোকদের বল, কেননা মানুষ এ বিষয়ে অনবহিত। এই আকাঙ্খা একারণে যে এটা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য প্রদান করবে । আমরা তোমাদের প্রতি সহমর্মিতার কারণে একথা বলি।

সুতরাং একজন বন্দির একটা ঘটনা এরূপ বর্ণিত হয়েছে। সঈদ বিন আবি সঈদ বর্ণনা করেন যে তিনি হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ' নাজাদ' এর দিকে যখন সৈন্য রওনা করেন, 'বনু হানিফা'র (একটি গোত্র) একজন ব্যক্তিকে বন্দী করে আনা হয় যার নাম ছিল সুমামা বিন আসাল । সাহাবারা তাকে মসজিদে নবুবীর স্তম্ভের সাথে বেঁধে দেন। রসুলে করীম (সাঃ) তার কাছে গিয়ে বললেন, "হে সুমামা ! তোমার কাছে কি অজুহাত আছে বা তোমার সাথে যা আচরণ হবে তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কিরূপ?" সে বলল, " আমি ভাল ধারণা পোষণ করি। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তবে একজন হত্যাকারীকে হত্যা করবেন। কিন্তু যদি আমাকে পুরষ্কৃত করেন তবে এমন একজনকে পুরষ্কৃত করবেন যে উপকারকে অনেক সম্মান দেয়। যদি সম্পদ চান তবে যতটা চান নিয়ে নিন । (এর জন্য সেই পরিমাণ সম্পদ তার জাতির পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব ছিল।) এরই মধ্যে একদিন অতিবাহিত হল। তিনি(সাঃ) পুনরায় উপস্থিত হলেন এবং সুমামাকে তার অভিপ্রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সুমামা বললেন , "আমি তো গতকালকেই আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে যদি আমাকে পুরষ্কৃত করেন ,তবে তিনি এমন একজনকে পুরষ্কৃত করবেন যে উপকারকে অনেক সম্মান দেয়।" তিনি (সাঃ) তাকে সেখানে সে অবস্থাতেই রেখে দিলেন। তৃতীয় দিন উদিত হল। তিনি (সাঃ) পুনরায় তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং সুমামার অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সে বলল, " যা বলার ছিল বলে দিয়েছি।" তিনি (সাঃ) তাকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। অতএব সুমামাকে মুক্তি দেওয়া হল। এর পর সুমামা মসজিদের নিকটবর্ত্তী খেজুরের বাগানে গিয়ে স্নান করল। এবং তারপর মসজিদে প্রবেশ করে কলেমা শাহাদত পাঠ করল। এবং বলল, " হে মহম্মদ! খোদার কসম আমার কাছে পৃথিবীতে সব থেকে অপ্রিয় চেহারা ছিল আপনার চেহারা, কিন্তু আজ এইরূপ অবস্থা যে আপনার চেহারা আমার কাছে পৃথিবীর সবচাইতে প্রিয় চেহারা। খোদার কসম! আমার কাছে পৃথিবীর সবচাইতে অপছন্দনীয় ধর্ম ছিল আপনার ধর্ম । কিন্তু আজ এমন অবস্থা যে আমার কাছে পৃথিবীর সবচায়তে প্রিয় ধর্ম হল আপনার আনীত ধর্ম। খোদার কসম ! আপনার শহরকে সবথেকে বেশি অপছন্দ করতাম। এখন এই শহরই আমার কাছে সবচায়তে প্রিয়। আমি উমরা করতে চাইছিলাম এরূপ অবস্থায় আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে ধরে ফেলে।" সে উমরা করতে যাচ্ছিল শুনে তিনি (সাঃ) তাকে সুসংবাদ দেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার কারণে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং আদেশ করেন, "যাও উমরা কর। আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন।" যখন সে মক্কা পৌঁছয়, জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি 'সাবি' হয়ে গেছ?" তখন সে উত্তর দেয় , "না আমি মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর ঈমান এনেছি। খোদার কসম! এর পর থেকে ইয়ামামার দিক থেকে তোমাদের দিকে গমের একটা দানা পর্যন্ত পৌঁছাবে না যতক্ষন না আঁহযরত (সাঃ) এর অনুমতি প্রদান করেন।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাজি)

অপর একটি বর্ণনায় আছে যে ইসলাম গ্রহণ করার পর যখন তিনি উমরা করতে যান, তখন মক্কার কাফেররা তার মুসলিম হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তাকে মারার চেষ্টা করে বা মারে। তখন তিনি বলেন যে, একটা শস্যদানাও পৌঁছবে না। এবং ততক্ষন পর্যন্ত আসবেনা যতক্ষন না আঁ হযরত (সাঃ) এর পক্ষ থেকে অনুমতি আসে। সুতরাং সে তার জাতিকে গিয়ে বলে এবং সেখান থেকে শস্যদানা আসা বন্ধ হয়ে যায়। অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন আবু সুফিয়ান আঁ হযরত (সাঃ)– এর কাছে এই অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হয় যে, তারা এরূপ অনাহারে মারা যাচ্ছে। নিজের জাতির উপর একটু দয়া করুন। এর উত্তরে আঁ হযরত (সাঃ) একথা বলেননি যে , খাদ্যশস্য তখনই পাবে যখন তোমরা মুসলমান হবে। বরং তিনি তৎক্ষণাৎ সুমামাকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বার্তা পাঠিয়েছেন। এবং বলেছেন যে এটা অত্যাচার। শিশুদের , বয়স্কদের ও অসুস্থদের আহারের প্রয়োজন হয় । তাদের জন্য তা উপলব্ধ হওয়া উচিত। (সীরাতুন্নবুয়াত, লিইবনে হিশাম)।

অতএব অন্যেরা দেখুক, কয়েদী সুমামাকে একথা বলেননি যে, তুমি আমাদের হাতে বন্দী রয়েছ , তাই তুমি মুসলমান হয়ে যাও। তিন দিন পর্যন্ত তার সঙ্গে সৎ ব্যবহার হয়। শুধু তাই নয় এক্ষেত্রেও উন্নত আচরণের মান বজায় রাখা হয়। তাকে মুক্তি দেওয়া হল, কিন্তু অপরদিকে সুমামাও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জেনে ছিলেন যে, এই দাসত্বের মধ্যেই

দ্বীন ও দুনিয়ার মঙ্গল নিহিত রয়েছে। তাই তিনি স্বাধীনতা পাওয়া মাত্রই রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে দিলেন।

তাছাড়া তিনি (সাঃ) একজন ইহুদি বন্দীকে হাতে পেয়েও নিজের কথা মানার জন্য বাধ্য করেননি । এমনকি সে এমন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, আশঙ্কাজনক অবস্থা দেখে তার পরিণাম শুভ হওয়ার বিষয়ে তিনি(সাঃ) চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি চিন্তিত ছিলেন এই কারণে যে , সে যেন খোদার শেষ বিধানকে অস্বীকারকারী রূপে ইহজগত ত্যাগ না করে। বরং তার প্রস্থানের সময় সে যেন একজন সত্যগ্রহণকারী রূপে বিবেচিত হয়। যেন আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা লাভের উপকরণ হয়। এমন পরিস্থিতিতে তার শূশ্রুষার জন্য আঁ হযরত(সাঃ) উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার কথা বলেন।

সুতরাং হযরত আনাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে , আঁ হযরত (সাঃ) এর এক সেবক অসুস্থ হয়ে পড়ে, যে একজন ইহুদি ছিল । রসুলুল্লাহ (সাঃ) তার শূশ্রুষার জন্য এলেন । তার মাথার কাছে এসে বললেন , ইসলাম গ্রহণ কর। অপর একটি বর্ণনায় আছে যে , সে তার অভিভাবকদের দিকে দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু যাই হোক সে অনুমতি পাওয়ার পর বা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। (সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েজ)

অতএব, তার ইসলাম গ্রহণ করার এই ঘটনাটিতে অবশ্যই সেই স্নেহের পরশ ও স্বাধীনতার প্রভাব ছিল যা আঁ হযরত(সাঃ) এর দাসত্ব করার সময় সেই ছেলেটিকে মুগ্ধ করেছিল। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে অবশ্যই এটা সত্য ধর্ম, তাই এটা গ্রহণ করা নিরাপদ। কেননা দয়া ও করুণার এই মূর্তপ্রতীক আমার অনিষ্ট ও অমঙ্গল কামনা করতেই পারেনা। নিশ্চয় তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা অপরকে সর্বোত্তম বিষয় ও কাজের দিকেই আহ্বান করেন, তারই উপদেশ দিয়ে থাকেন। অতএব এই স্বাধীনতাই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পৃথিবীতে কোথাও এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

তাঁর নবুয়তের দাবির পূর্বেও অভিব্যক্তি প্রকাশ, ধর্মের স্বাধীনতা এবং জীবনযাপনের স্বাধীনতা পছন্দ করতেন এবং দাসত্বকে অপছন্দ করতেন। তাই যখন হযরত খাদিজা (রাঃ) বিবাহের পর তাঁর সমস্ত সম্পদ ও ক্রীতদাসদেরকে আঁ হযরত(সাঃ) কে দিয়ে দেন , তিনি (সাঃ) তখন হযরত খাদিজা (রাঃ) কে বললেন, " যদি এই সব সম্পদ আমাকে দাও তবে এর সমস্ত কিছু আমার অধিকারে থাকবে, আমি যা খুশি করতে পারি।" তিনি (রাঃ) বললেন, " সেজন্যই আমি দিচ্ছি।" তিনি (সাঃ) বললেন, " আমি ক্রীতদাসদেরও মুক্তি দিব।" তিনি (রাঃ) বললেন, "আপনি যা খুশি করতে পারেন, আমি আপনাকে দিয়ে দিয়েছি , এই সম্পদ আপনার, এখন আমার কোনো অধিকার নেই। সুতরাং তিনি(সাঃ) তখনই হযরত খাদিজার (রাঃ) ক্রীতদাসদের ডেকে বললেন , "আজ থেকে তোমরা সকলে স্বাধীন।" এবং সম্পদের অধিকাংশ গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

যে সকল ক্রীতদাস তিনি মুক্ত করেছিলেন তাদের মধ্যে জায়েদ নামে একজন গোলাম ছিলেন। তিনি হয়তো অন্যান্য ক্রীতদাসদের থেকে বেশি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি একথা বুঝতে পারেন যে আমি এখন যে স্বাধীনতা পেলাম, দাসত্বের যে মোহরের আজ অবসান হল , কিন্তু আঁ হযরত (সা) এর দাসত্বের বন্ধনে চিরকাল থাকাই আমার জন্য মঙ্গলজনক। তিনি বললেন যে ঠিক আছে, আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন , কিন্তু আমি নিজেকে মুক্ত করতে চাইনা। আমি আপনার কাছেই দাস হয়ে হয়ে থাকব। সুতরাং তিনি আঁ হযরত (সাঃ) এর কাছেই ছিলেন। দুই পক্ষ থেকেই ভালবাসার সম্পর্ক উন্নতি লাভ করতে থাকে। জায়েদ এক বিত্তশালী ও সম্পন্ন পরিবারের সদস্য ছিলেন। দস্যুরা তাকে অপহরণ করে নেয়। পরে বিভিন্ন স্থানে তাকে বিক্রয় করা হতে থাকে এবং এইভাবেই তিনি এখানে পৌঁছেছিলেন। অপরদিকে তার মাতা-পিতা ও আত্মীয় পরিজনেরাও তার সন্ধানে ছিল।

অবশেষে যখন তারা জানতে পারল যে সেই ছেলে মক্কায় রয়েছে তখন তারা মক্কায় চলে আসেন। তার পর যখন জানতে পারল যে সে আঁ হযরত (সাঃ) এর নিকট রয়েছে , তারা আঁ হযরত (সাঃ) এর মজলিসে উপস্থিত হল। সেখানে এসে তারা নিবেদন করল, "আপনি যতটা সম্পদ চান নিয়ে নিন, বিনিময়ে আমাদের পুত্রকে মুক্ত করে দিন। এর মা কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে গেছে।" তখন আঁ হযরত (সাঃ) বললেন , "আমি তো অনেক আগেই একে মুক্ত করে দিয়েছি। সে এখন স্বাধীন। যদি যেতে চাই তবে চলে যাক। আমার কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই।" তারা বলল, " পুত্র , চল। " পুত্র উত্তর দিল, " তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ হল এটাই যথেষ্ট। যদি কখনও সুযোগ হয় তবে মায়ের সাথেও সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না। আমি তো এখন আঁ হযরত (সাঃ) এর দাস হয়ে গেছি, তাঁকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এখন তাঁকে মাতা-পিতার চায়তেও বেশি ভালবাসি।" জায়েদের চাচারা অনেক অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। জায়েদের ভালবাসা দেখে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছিলেন , 'জায়েদ প্রথম থেকেই স্বাধীন ছিল , কিন্তু আজ থেকে সে আমার পুত্র।" এরূপ পরিস্থিতি দেখে জায়েদের পিতা ও চাচারা সেখান থেকে নিজেদের দেশে ফিরে যাই, এবং তার পর থেকে জায়েদ সেখানেই থাকেন। (মুলখিস আজ দিবাচা তাফসিরুল কুরান)

নবুয়তের পর আঁ হযরত (সাঃ) এর এই স্বাধীনতার মানদন্ড আরও উচ্চ মানে উপনীত হয়েছিল। এখন তাঁর সৎ চরিত্রের সঙ্গে নিজের উপর অবতীর্ণ বিধানও যুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ গোলামদেরকে তাদের অধিকার দেওয়া এবং তা না করতে পারলে তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ ছিল।

অতএব একটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, একজন সাহাবি তার গোলামকে প্রহার করছিল। এই দৃশ্য আঁ হযরত(সাঃ) প্রত্যক্ষ করে ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হন। এরপর ঐ সাহাবী সেই গোলামকে মুক্ত করে দেন। আঁ হযরত(সাঃ) বললেন, "যদি তুমি একে মুক্তি না দিতে তবে খোদা তায়ালার শাস্তির কবলে পড়তে।" (সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান , বাব সোহবাতুল মুমালিক)

এটাই হল প্রকৃত স্বাধীনতা। আবার অন্যান্য ধর্মের মানুষের জন্য নিজেদের অভিমত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতারও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। তাঁর (সাঃ) নিজের শাসন ব্যবস্থায় অর্থাৎ যখন মদিনায় তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছিল, সেই সময় এই স্বাধীনতার নমুনা পাওয়া যায়।

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, দুই জন ব্যক্তি পরস্পরকে গাল মন্দ করছিল। একজন মুসলমান ও অপরজন ইহুদি ছিল। মুসলমান ব্যক্তি বলছিল, "সেই সত্তার কসম যিনি মহম্মদ (সাঃ) কে সমস্ত বিশ্বের জন্য নির্বাচিত করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।" ইহুদি ব্যক্তি বলছিল, "সেই সত্তার কসম যিনি মুসাকে সমস্ত বিশ্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন।" এই কথা শুনে মুসলমান ব্যক্তি ইহুদি ব্যক্তিকে চপোটাঘাত করল। ইহুদি অভিযোগ নিয়ে আঁ হযরত(সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হল। যা শুনে আঁ হযরত (সাঃ) মুসলমান ব্যক্তির কাছে বিবরণ জানতে চান এবং বলেন। "লা তুখায়্যুরুনী আলা মুসা" অর্থাৎ মুসার উপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিওনা। (বুখারী কিতাবুল খসুমাত)

এটা ছিল আঁ হযরত(সাঃ) এর স্বাধীনতা, ধর্ম ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার মাপদন্ড। মদিনা হিজরত করার পর তিনি (সাঃ) মদিনার গোত্রগুলি ও ইহুদিদের সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ স্থাপনের করার জন্য একটি চুক্তি করেছিলেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে অথবা ঐ সকল লোক যারা মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাদের কারণে আঁ হযরত (সাঃ) এর হাতে শাসনভার ছিল। কিন্তু এই রাজত্বের এই অর্থ ছিলনা যে অন্যান্য প্রদেশ বা প্রদেশের অন্যান্য সকল মানুষদের , তাদের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য ছিল না। তিনি (সাঃ) যে সমস্ত রসুলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কুরান করীমের এই সাক্ষ্য প্রদান সত্ত্বেও তিনি চান নি , নবীগণের মধ্যে তুলনা করার প্রতিযোগিতার ফলে পরিবেশ কুলষিত হোক। তিনি (সাঃ) সেই ইহুদির কথা শুনে মুসলমান ব্যক্তিকেই ভর্ৎসনা করেন। তিনি (সাঃ) বলেন , "নিজেদের ঝগড়া বিবাদের মধ্যে নবীদেরকে টেনে আনবে না। যদিও আমি তোমাদের নিকট সমস্ত রসুল থেকে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তায়ালাও এর সাক্ষ্য প্রদান করছেন, কিন্তু আমাদের রাজ্যে এমন কাজের অনুমতি আমি দিতে পারি না যার ফলে কোনও নবীর বিরুদ্ধে কিছু বলার কারণে এক ব্যক্তির মনোপীড়া হয়। আমাকে সম্মান করতে হলে তোমাদেরকে অপরাপর সকল আম্বিয়ার সম্মান করতে হবে।"

যুগ খলীফার বাণী

"আপনি নিজে এবং পরিবারের সদস্যগণ এম.টি.এ শোনার বিষয়ে গুরুত্ব দিন, আমার খুতবা এবং বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণগুলি শুনুন।" (২০১৬ সালের ঘানা জলসায় প্রদত্ত বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

"খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রত্যেক আহমদীকে এম.টি.এ শোনা দরকার, এর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।" (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠা মার্চ, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 23 July , 2020 Issue No.30

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

ইউনেস্কোতে হুযুরের ভাষণ

(পূর্ববর্তী সংখ্যার পর....)

সূরা বাকারার ১৩৯ নং আয়াতে এক অপূর্ব সুন্দর নীতি বর্ণিত হয়েছে। নীতি হল, মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তা'লার পথে পদচারণা করা উচিত এবং তাঁর গুণাবলীকে ধারণ করা উচিত। যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি যে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। তিনিই সকলের অন্নদাতা, এমনকি তাদেরও যারা তাঁর অস্তিত্বেরও অস্বীকারকারী। আল্লাহ্র দয়া ও কৃপা তাদের জন্যও যারা তাঁকেই শাণিত বাক্যবাণে বিদ্ধ করে কিম্বা পৃথিবীতে অন্যায়-অত্যাচার করে চলেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলাম ধর্মে খোদার পক্ষ থেকে শাস্তি ও প্রতিদান পাওয়ার সম্পর্ক পরকালের সঙ্গে অধিক। যেহেতু ইহজগতে আল্লাহ্র দয়া ও কৃপা নিরন্তর হয়ে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে তাঁর নিজের গুণাবলী ধারণ করার শিক্ষা দান করে বলেছেন, তারাও যেন অন্যদের প্রতি দয়া ও সহানুভুতি প্রদর্শন করে। কাজেই ধর্মমত, সংস্কৃতি, জাতি ও বর্ণের ভেদাভেদ মুছে সব সময় অন্যের চাহিদা পূরণ করা, তাদের প্রতি সহানুভুতিপূর্ণ আচরণ করা এবং তাদের ভাবাবেগের প্রতি সংবেনশীল থাকা মুসলমানদের ধর্মীয় কর্তব্য। এছাড়াও কুরআন করীম এও দাবি করেছে যে আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (সা.) কে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি ছিলেন সহানুভুতির ইসলামি শিক্ষার বাস্তব দৃষ্টান্ত। তিনি যখন 'ইসলাম' ধর্মের ভিত্তি রাখেন, সেই সময় তাঁকে এবং তাঁর সাথীদেরকে মক্কার অমুসলিমদের পক্ষ থেকে বর্বরোচিত বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়, যা তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও অবিচলতার সঙ্গে সহন করেন। অবশেষে জুলুম ও নির্যাতন যখন সীমাতিক্রম করল, তখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন, যেখানে তিনি মুহাজির, ইহুদী এবং অন্যান্য গোত্রের মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি অনুসারে বিভিন্ন জাতি ও গোত্র শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার, অপরের অধিকার রক্ষার, পারস্পরিক সহানুভুতি ও সহযোগিতার এবং সহিষ্ণুতা প্রসারের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। রসূল করীম (সা.) রাজ্যের শাসক বা অভিভাবক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে এই চুক্তি মানবাধিকার এবং শাসনব্যবস্থার এক অসাধারণ সনদ সাব্যস্ত হয়, যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও যুদ্ধ বিরাম সুনিশ্চিত করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের পয়গম্বর ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার জন্য নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে ধনী-দরিদ্র, দুর্বল ও শক্তিশালী, সকলের জন্য একই আইন থাকবে, প্রত্যেকের সঙ্গে এই আইন অনুসারেই আচরণ করা হবে। যেমন, একবার এক প্রভাবশালী মহিলা কোন এক অপরাধ করলে অনেকে প্রস্তাব দেয় যে তার অপরাধ উপেক্ষা করা হোক। রসূল করীম (সা.) সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্পষ্ট করে দেন যে যদি তাঁর কন্যাও অপরাধ করত, তবে তাকেও কোনও ছাড় দেওয়া হত না, বরং সে আইন অনুসারে শাস্তি পেত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও রসূল করীম (সা.) অত্যন্ত উচ্চমানের শিক্ষার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলেন যার দ্বারা সমাজে উন্মুক্ত চিন্তাধারার মান বিকশিত হয়। শিক্ষিত এবং লেখাপড়া জানা মানুষদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে তারা নিরক্ষর মানুষদেরকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করবে। সমাজে অনাথ এবং দুর্বলদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এসব কিছু এজন্য করা হয়েছিল যাতে দুর্বল ও অসহায়রা স্বনির্ভর হতে পারে এবং জীবনে অগ্রসর হতে পারে। কর আদায়ের ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার দ্বারা সমাজের ধনীদের কাছ থেকে কর নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে ব্যয় করা হত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমের শিক্ষামালা অনুসারে ইসলামের পয়গম্বর একটি বাণিজ্য নীতি ও আচরণ-বিধি তৈরী করেছিলেন যাতে এবিষয়টি সুনিশ্চিত করা যেতে পারে যে বাণিজ্য ন্যায় ও সততা সহকারে পরিচালিত হচ্ছে। ক্রীতদাস প্রথার সেই যুগটিতে মালিকেরা দাসদের প্রতি অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করত। ইসলামের পয়গম্বর তৎকালীন সমাজে এই বিষয়ে এক বিপ্লব নিয়ে আসেন। মালিকদেরকে আদেশ দেওয়া হয় তারা যেন দাসদের প্রতি সহানুভুতিপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করে, এছাড়াও তিনি বার বার তাদেরকে মুক্ত করে দিতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নেতৃত্বে সার্বজনীন স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাও তৈরী হয়েছিল। শহরের পরিচ্ছন্নতার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং সাধারণ মানুষকে শারিরিক পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। শহরে প্রশস্ত এবং উন্নত সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। নাগরিকদের চাহিদাবলী নিরুপণ এবং অন্যান্য তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য আদমশুমারির ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়েছিল। তাই সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের পয়গম্বরের শাসনের নেতৃত্বে মদীনায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকারের উন্নতিকল্পে অভূতপূর্ব সব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে আরব জাতিতে এই প্রথম বার যথারীতি এক সভ্য ও সুসংহত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমাজ বিভিন্ন দিক থেকে অতুলনীয় ছিল। যেমন, পরিকাঠামো, পরিষেবা এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ছিল সমাজের ঐক্য ও সহিষ্ণুতার প্রতীক। মুসলমানেরা সেখানে অভিবাসী হিসেবে এসেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানীয় সমাজে তারা একীভূত হয়ে যায় এবং সেখানকার উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে নিজেদের অবদান রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এসব কিছু সত্ত্বেও বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে এই ইসলামী শিক্ষার আলোকেও বর্তমান পৃথিবী ইসলামের পয়গম্বরের অবমাননা হচ্ছে। তাঁকে এক যুদ্ধবাজ নেতা হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা সত্যের অপলাপ ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত, রসূল করীম (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষণ অপরের অধিকার রক্ষায় ব্যতীত করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে মানবাধিকারের এক অনন্য ও চিরস্থায়ী ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। যেমন- তাঁর শিক্ষা হল মানুষ একে অপরের ধর্মমত এবং ভাবাবেগের প্রতি যত্নবান থাকবে এবং একে অপরের ধর্মীয় মণীষীদের নিয়ে সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে।

একবার এক ইহুদী আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁরই এক নৈকট্যভাজন সাহাবার নামে অভিযোগ নিয়ে আসে। যা শুনে রসূল করীম (সা.) সেই সাহাবীকে ডেকে পাঠান এবং সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সাহাবী বলেন, সেই ইহুদী বলছিল, হযরত মূসা (আ.) রসূল করীম (সা.)-এর থেকে শ্রেষ্ঠ। একথা আমার সহ্য হয় নি বলে আমি তাকে কঠোরভাবে জবাব

এরপর ৯ পাতায়....

যুগ ইমামের বাণী

" প্রকৃত ঈমান সেটিই যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং তার কর্মপন্থাকে নিজের রঙে রঙীন করে তোলে" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

সেই ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কখনও বিনষ্ট করেন না, যে কেবল তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। বরং এমন ব্যক্তির জন্য তিনি স্বয়ং অভিভাবক হয়ে ওঠেন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir